ইগুয়াজু জলপ্রপাত, ব্রাজিলের দিক থেকে - আলোকচিত্রী শ্রীমতী শ্রাবণী ব্যানার্জি

আমাদের ছুটি হচ্ছে হলেই...

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ- শ্রাবণ ১৪৩০

বাঙালির চিরচেনা 'দিপুদা' অর্থাৎ দিঘা-পুরী-দার্জিলিং-এর ভ্রমণকাহিনি সংকলন নিয়ে তিনটে বইয়ের সম্পাদনা করছিলাম এক প্রকাশকের আমন্ত্রণে - এবছরের কলকাতা বইমেলাতে বের করার জন্য। কাজটা করতে করতেই আমাদের ছড়িয়েছিটিয়ে যাওয়া যৌথ পরিবারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল এবারের বাৎসরিক পিকনিকটা হবে দার্জিলিং-এ। সকলের সুবিধেমতো দিনক্ষণ ঠিক করতে করতে শেষ অবধি মে মাসের ঘোর গরমে দিন তিনেকের জন্য দার্জিলিং পৌঁছেও গেলাম। দার্জিলিং-এও বেজায় গরম তখন। সমতলের লোকজনের গরমের ছুটির ম্যাল-অভিমুখী ভিড় মনে করায় ইদানীন্তন বড়দিনের কলকাতার পার্ক স্ট্রিটকে আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে হিলকার্ট রোডে বিশাল ট্রাফিক জ্যাম। তবে এসব সত্ত্বেও দার্জিলিং-এর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। মেঘমালার মধ্যে দিয়ে টাইগার হিলে একঝলক সূর্যোদয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা, ম্যাল রোড-এর একদিক থেকে চক্কর দিয়ে রাজভবন আর ভিউপয়েন্টের নিরালা পেরিয়ে অন্যপাশ দিয়ে আবার ম্যালে ফিরে আসা থেকে অক্সফোর্ড বুকস্টোরে হিমালয় সংক্রান্ত বইপত্র নাড়াচাড়া, কেভেন্টার্সের ছাদে ব্রেকফাস্ট সবই দিব্যি আছে। ম্যালে একটা জায়ান্ট স্ক্রিন বসিয়ে সারাক্ষণ নাচ-গানের ভিডিও রেকর্ডিং দেখানো হচ্ছে সেটা অবশ্য পছন্দ হল না একেবারেই। তবু হিমেল সন্ধ্যায় ম্যালের রেলিং-এর একধারে বসে মানুষজন, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এইসব দেখতে দেখতে এক কাপ চা হাতে আমি দার্জিলিং-কেই ভীষণভাবে উপভোগ করছিলাম। মনে পড়ছিল সিকিমের রাজার থেকে দোর্জে-লিং অর্থাৎ 'বজ্রের দেশ'-এর হাতবদল হয়ে ব্রিটিশ কোম্পানির বড়লাটের গ্রীষ্মাবাস দার্জিলিং হয়ে ওঠার নানা কাহিনি।

১৮৩৯ সালে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'তে দার্জিলিং থেকে এক সাহেব চিঠি লিখছেন, ইংরেজদের জন্য সদ্যনির্মিত স্বাস্থ্যনিবাস স্যানেটোরিয়ামের বেডরুমে ফায়ার প্লেস নেই। দার্জিলিং পাহাড়ের সৌন্দর্য এবং পাহাড়ি পথ যে পালকি আর গরুর গাড়ি চলার মতো হয়েছে সেইসব খবর পাওয়া যায় আরেক সাহেবের চিঠিতে। সমতল থেকে দার্জিলিং-এ পৌঁছানোর রাস্তাও তৈরি হয়ে গেছে সেই বছরই। পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়ে সেই পথেই দার্জিলিং এসেছিলেন ১৮৯৭ সালে মার্ক টোয়েন। বিচিত্র এক গাড়িতে সওয়ার হয়ে দার্জিলিং-এর পাহাড়ি পথে অভিযানের কথা লিখেছেন তাঁর 'ফলোয়িং দ্য ইকুয়েটরঃ আ জার্নি রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড (১৮৯৭)' বইটিতে। গাড়িটি অনেকটা স্লেজের মতো। প্রায় মাটি ছোঁয়া নিচু সিটে ছজন বসতে পারবে। আর তাতে থাকার মধ্যে আছে কেবল একটা ব্রেক। সে এক শ্বাসরোধী অভিজ্ঞতা।

দার্জিলিং পাহাড়ের সৌন্দর্য বা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণি দর্শন শুধু সাহেবদের নয়, মুগ্ধ করেছে এ দেশের প্রায় সব ভ্রমণার্থীকেই। তাই স্বাধীনতার আগে বা পরে বারবারই দার্জিলিং সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, উপেন্দ্রকিশোর, জলধর সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল থেকে শুরু করে এযুগের অনেক সাহিত্যিকই দার্জিলিংকে এড়াতে পারেননি তাঁদের সৃষ্টিতে।

পর্যটন ব্যাবসার তাগিদে যতই ঘিঞ্জি হয়ে উঠুক না কেন দিনে দিনে, দার্জিলিং এখনও অতুলনীয়া। এবারের এই সপ্তাহান্তিক দার্জিলিং ভ্রমণটা আরও মনে থেকে যাবে কারণ ফিরে আসার কিছুকালের মধ্যেই এক পথ দুর্ঘটনায় চিরবিদায় নিলেন ভ্রমণসঙ্গীদের একজন।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

আমাদের ছুটি – ৪৩শ সংখ্যা

~ এই সংখ্যায় ~

"এম্‌নি করে' বার বার আমরা দেখ্‌ছি চীনের মুখ আমাদের চেনা হয়নি; নিজেদের অনেক মনগড়া দাবী-দাওয়া, অনুযোগ অভিযোগ আমরা চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে আস্‌ছি, অথচ চীন নির্ব্বিবাদে সে-সমস্ত ওলোট পালট করে' দিয়ে নিজের খোস-খেয়ালের ভরে নিজের পথটি ধরে' চলেছে। কে জানে এম্‌নি করে' কতবার চীন আচম্‌কা ভবিষ্যতের ইতিহাসকে মধুর অথবা নিষ্ঠুর পরিহাসে উদভ্রান্ত করে' চলবে!
- ঐতিহাসিক ও লেখক শ্রী কালিদাস নাগের লেখনীতে "চীনের চিঠি"

~ আরশিনগর ~

অরণ্যের দুয়ারে – তপন পাল

~ সব পেয়েছির দেশ ~

এক টুকরো তিব্বত – প্রজ্ঞা পারমিতা

আমাদের ছুটি – ৪৩শ সংখ্যা

নাগজিরার জঙ্গলে – দেব মুখার্জি

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক (তৃতীয় পর্ব) – মৃণাল মণ্ডল

~ ভুবনডাঙা ~

ওকাম্পোর দেশে – শ্রাবণী ব্যানার্জী

শ্যামদেশের চাও ফ্রায়া নদী – মার্জিয়া লিপি

~ শেষ পাতা ~

সূর্যাস্তের হাট – তৃষ্ণা বসাক

রাবড়ি গ্রাম ভ্রমণ – সৌমাভ ঘোষ

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2023 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

-->

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্র

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ – তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

[ডঃ কালিদাস নাগ (১৮৯১ –১৯৬৬) ছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক ও লেখক। তাঁর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শিবপুরে। পিতা মতিলাল নাগ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শিবপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে এফ.এ. এবং ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ.পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহল মহেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হন এবং এই বছরেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুলেখিকা শান্তা দেবী।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জেনিভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রাচ্য ও চীন সফরে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য হন রাজ্যসভার। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। বিশিষ্ট ফরাসি নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।
মূল লেখাটি 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

চীনের চিঠি

শ্রীকালিদাস নাগ

আজ চীন দেশে নাম্‌ব। ভোরে 'ডেকে' এসে দেখা গেল জাহাজ সমুদ্র ছেড়ে ইয়াঙ-সি-কিয়াঙ নদীর উপর দিয়ে চলেছে, কত রকমের ঔৎসুক্য জমা হয়ে মনটাকে অস্থির করে' তুলছে, ক্রমশঃ চোখে পড়ল দূরের তটভূমি – সাদা বালুচর বৈচিত্র্যহীন চীনেম্যানের মুখের মতনই বর্ণহীন বাহুল্য-বর্জ্জিত। আশ্চর্য্য এই জাতটির মুখ! জাহাজ থেকে নেমে অবধি নানা জিনিষ দেখিছ, কিন্তু সবচেয়ে মনকে আকর্ষণ কর্‌ছে চীনের মুখ। সে মুখ কি বল্‌ছে? ভাষা না জেনেও অনেক জাতের মুখের দিকে চেয়েছি – তারা কি বল্‌তে চাইছে আভাসে বুঝেছি, কিন্তু চীনের বেলায়, শুধু কথার ভাষা নয়, চোখের ভাষা, চালের ভাষাও যেন আমাদের কাছে হেঁয়ালী ঠেকে! আমরা ভাবি এক, চীনে যেন বলে আর! ভাবা গিয়েছিল টিকিধারী চীনে চূড়ান্ত গতানুগতিক – হঠাৎ একদিন দেখা গেল চীনে টিকি উড়িয়ে বেশ খানিক এগিয়ে ছুটে এসেছে। লোকে ভেবেছিল, চীনের শাসনতন্ত্রে সম্রাটের আসন বুঝি অটল। হঠাৎ কোথা থেকে কেমন করে' চীনে যে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে' বস্‌ল বোঝাই গেল না।

এম্‌নি করে' বার বার আমরা দেখ্‌ছি চীনের মুখ আমাদের চেনা হয়নি; নিজেদের অনেক মনগড়া দাবী-দাওয়া, অনুযোগ অভিযোগ আমরা চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে আস্‌ছি, আর চীন নির্ব্বিবাদে সে-সমস্ত ওলোট পালট করে' দিয়ে নিজের খোস-খেয়ালের ভরে নিজের পথটি ধরে' চলেছে। কে জানে এম্‌নি করে' কতবার চীন আচম্‌কা ভবিষ্যতের ইতিহাসকে মধুর অথবা নিষ্ঠুর পরিহাসে উদভ্রান্ত করে' চলবে!

তাই চীনের মুখের দিকে চেয়ে রহস্য যতই ঘনিয়ে আস্‌তে দেখ্‌ছি ততই মনটা সেই রহস্য ভেদ কর্‌তে উন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌ছে। সাঙহাই বন্দরে জাহাজ লাগ্‌তেই দেখি চীনে ডিঙ্গির এক বিপুল বাহিনী যেন বন্দরকে ছেয়ে ফেলেছে, ছোট ছোট নৌকার উপর মাল চড়িয়ে তীরে নিয়ে যাবে; পুরুষরা মাল বোঝাই কর্‌ছে, নৌকার উপর এক মেয়ে রান্না চড়িয়েছে, একহাতে রাঁধবার খুন্তি, অন্যহাতে দাঁড়; পিঠে একটি শিশু কাপড় দিয়ে বাঁধা! সমানে তিন দিকে তাল দিয়ে যাচ্ছে একা – আশ্চর্য্য কর্ম্মঠ এই নিম্নশ্রেণীর চীনে মেয়েরা। সেই নৌকার টলমলানির মধ্যে সংসার-যাত্রা বেশ চলে' যাচ্ছে – পুরুষ খানিক খেটে হাঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, মেয়েটি তার হাতে একটা বাটি দিয়ে তার মধ্যে হাঁড়ির ভিতরকার খানিক পদার্থ তুলে দিলে। পুরুষ ভোজন শেষ করে' আবার কাজে ছুট্‌ল, যেন শ্রান্তি-আলস্য কি এরা জানে না। পিঠে-বাঁধা খোকাটা পিট্ পিট্ করে' চাইছে আর আবাঁধা হাত-পা নেড়ে যেন এখন থেকেই কাজের পাঁয়তারা কস্‌ছে। তার চেয়ে একটু বড় ছেলেটা তার চেয়ে বিশগুণ ভারী দাঁড়টা ছোট্ট হাতের মধ্যে টিপে ধরে' ছপ্‌ছপ্ করে' জল টান্‌ছে, দেখে যেন বিশ্বাস হয় না। দাঁড়টা হাত থেকে ফস্‌কে গেলে বানরের মতন লাফিয়ে আবার ধর্‌ছে। কাজটা যেন খেলা – খাটুনী যেন স্বভাব এ জাতের। আমাদের কুলীদের আধ্যাত্মিক হাইতোলা আর ফুটপাথের উপর অনন্তশয়নের কথা মনে পড়্‌তেই ভারত ও চীনের মধ্যে মস্ত একটা পার্থক্য প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল। তীরে নেমে দেখ্‌ছি চীনে কুলী মোট নিয়ে চলেছে,

কেউ নিয়েছে মাথায়, কেউ ঠেলা-গাড়ীতে। একজন কুলী হাত-গাড়ীতে যে মোট ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার আয়তন দেখেই আমাদের কুলীরা হাই তুলে বল্‌বে "সকলই মিথ্যা শুধু হরিনাম সত্য"। চীনে মুটে যে বোঝা অকাতরে মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছে, সেটা দেখ্‌লে আমাদের দেশের মুটের পতন ও মূর্চ্ছা অবশ্যম্ভাবী।

চীনে কুলী মজুর যেন শ্রমশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। পুরুষদের বেশ মানায়, কিন্তু মেয়েদের এক্ষেত্রে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে; আমাদের দেশে খাটিয়ে মেয়ের মুখেও নারীত্বের একটা কমনীয়তা দেখ্‌তে পাই, সেটা চীনে মজুরনীদের না পোষাক-পরিচ্ছদে না ভাবে-ভঙ্গীতে মেলে! সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা পুরুষতা ছেয়ে গেছে। বিশেষতঃ কাটাছাঁটা কোর্ত্তা, পায়জামা, উৎকট চুল বাঁধা, কালো নীল পোষাক – সবটা মিলে যেন চক্ষুশূল হ'য়ে দাঁড়ায় – মনটা ব্যথিত হ'য়ে ফিরে ফিরে তাকায় সেই আমাদের দেশের শাড়ী ঘাগরার দিকে, যা নানা ছন্দে রঙে নানা স্তরের মেয়েদের সাজ নারীত্বের বৈচিত্র্যে সুন্দর করে' রেখেছে। সবচেয়ে আমাদের আঘাত করে চীনে রমণীদের এই বেশভূষার অবনতি; অতীত কালে যে মোটেই এরকম ছিল না – চীনের স্ত্রীপুরুষ পোষাক-পরিচ্ছদে যে উচ্চ সৌন্দর্য্য বোধ ও রুচির পরিচয় দিয়ে এসেছে, তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে এদের প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্র-কলায়। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তাঙ্ (Tang) সাম্রাজ্যের সময় পরিচ্ছন্নতা ও কলা-কুশলতার যে শিক্ষা চীনের কাছ থেকে জাপান পেয়েছে, তার নিদর্শন আজও জাপানকে গৌরবান্বিত করে' রেখেছে, কিন্তু সেই সুষমা-সৌষ্ঠবের আদি উৎস চীনের আজ কি দুর্দ্দশা! সন্দেহ হয় যেন সেই আদিম সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর একটা বিজাতীয় বর্ব্বরতার বাণ ডেকে সব ধ্বংস করে' গেছে।

সহরের পথে কিন্তু মধ্যে মধ্যে আর এক ছাঁচের মুখ চোখে পড়ছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পোষাক বেশ-একটু ওরি মধ্যে পরিপাটী; পরণের কাপড় কালো হ'লেও একটু রেশমের জলুস্ – একটু হাল্কা নীল রঙের আভাস দিচ্ছে, গৃহস্বামী ধীর গতিতে চলেছেন শান্ত গম্ভীর মুখে; পিছনে গৃহিণী চলেছেন, পোষাকে একটু বাহারের আমেজ – মুখে চোখে একরকমের কমনীয়তা আছে, অথচ ঠিক তার ধাতুপ্রত্যয় যেন আমাদের জানা নেই! বাঁধা পা মুক্তি পেয়েছে গণতন্ত্রের কৃপায়, কিন্তু পা যেন এখনও তেমন বশে আসেনি; চলার মধ্যে পাঁয়তারাটা যেন বেশী স্পষ্ট, ছন্দ এখনও জাগেনি। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত শিশুকে পিঠে না বেঁধে, বুকে করে' নেবার অভ্যাস এদের আছে; মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের, আমাদের দেশের মত পর্দ্দার বালাই নেই, অবাধে সর্ব্বত্র এরা চলা ফেরা করে। গৃহিণী ছেলেদের নিয়ে চলেছেন ... পথে চীনে রসুইকর নানা জিনিষ রেঁধে বাঁক-কাঁধে ফেরি করে' চলেছে ... অন্যান্য দেশের মত এখানে ফেরিওয়ালার "হাঁক" নেই, তার জায়গায় সাঙ্কেতিক আওয়াজ আছে; কাঠের বা লোহার কাটি দিয়ে ঠুকে যে-যে তালে আওয়াজ করে সেটা থেকে ছেলে-বুড়ো বুঝ্‌তে পারে কোন্ জিনিষ বেচ্‌ছে। পিছনে একটা আওয়াজ হতে চেয়ে দেখি একদল ছেলে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, বাঁকের মধ্যে 'ভ্রাম্যমাণ হোটেল' থেকে 'সোইয়া' সিম সিদ্ধ মাংস ইত্যাদি লোভনীয় জিনিষ খেতে চায়; ছেলেদের মা দর দস্তুর করে' কিনে দিচ্ছেন আর তারা মনের আনন্দে খাচ্ছে। এম্‌নি করে' চীনের রাস্তায়-রাস্তায় স্থাবর অথবা চলন্ত হোটেলে মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজন সেরে মানুষ কাজ-কর্ম্ম করে' যায়। প্রত্যেক বার বাড়ী গিয়ে খাবার বালাই নেই।

এদেশে একালের স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েদের মুখে একটা নতুন ভাব, নতুন জিনিষ দেখবার, বুঝবার, আয়ত্ত করবার আগ্রহ অসীম; এই দিক্‌টা কাছে এসে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা শক্ত, চীন যে চিরস্থবির এই ধারণাটাই যেন সাধারণের মনে পাকা হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের চারদিকে যে তরুণ চীন-দল সমবেত হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের একটা বড় রকম সংঘর্ষ অথবা বোঝাপড়া যে আরম্ভ হয়েছে, তা প্রতিপদে আমরা অনুভব করেছি; এদের আধুনিক শিক্ষার উপর পাশ্চাত্য প্রভাব পুরোদমে চল্‌ছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই পাশ্চাত্য পাদ্রীসঙ্ঘের হাতে; আধুনিক নাট্যশালায় এমন-কি চিত্রকলায়ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার ছাপ পড়ছে; রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতের নব্যশিক্ষিতের দল যেমন একটা নকল-নবিশীর অধ্যায় আমাদের ইতিহাসে লিখে এসেছে, নব্য চীনও আর এক রকমে সেই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলেছে। এই উলট-পালটের যুগে বিচার করা সহজ, কিন্তু বোঝা কঠিন; কারণ খুঁতগুলো প্রকট, কিন্তু স্থায়ী সঞ্চয়টা স্পষ্ট নয়; ঐতিহাসিক ছন্দবোধ বজায় রেখে চীনের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যদি কেউ দেখ্‌তে পারেন, তবেই এসমস্যার মর্ম্মোদঘাটন করা সম্ভব হবে। তুরস্ক থেকে চীন-জাপান পর্য্যন্ত প্রাচ্যখণ্ডে যে বিরাট্ ঐতিহাসিক নাট্যের অবতারণা হয়েছে, কবে কোন্ অজ্ঞাত সূত্রধার তার নান্দীবাচন করে' গেছেন, কত বিচিত্র অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের বিন্যাসের, কত রুদ্র বীভৎস শান্ত করুণ রস সঙ্গতিতে তার অনাগত ইতিহাস মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌বে কে জানে? শুধু জানি ছ'হাজার বছর পূর্ব্বে এক যুগ সন্ধিতে চীন এই ভারতের মুখের দিকে চেয়েছিল এবং ভারত মাতা তাঁর মৈত্রী-কল্যাণ-বিজ্ঞান ভিক্ষু সন্তানদের চীনে পাঠিয়েছিলেন; আজ আর এক যুগসঙ্কটে চীন আবার ভারতের দিকে চাইছে। ভারত-গৌরব রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে কত বড় ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার সিংহদ্বার খুলে গেল তা ভবিষ্যতই প্রকাশ কর্‌বে। তাঁর অনুগ্রহে যে-সব জিনিষ দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়েছে, তার কিছু কিছু আভাস দেবার ইচ্ছা রইল।

সাঙহাই, এপ্রিল ১৯২৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি

[অভ্রতে কিছু কিছু বাংলা বানান টাইপের অসুবিধাটুকু বাদ দিলে মূল লেখার বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

আমাদের ছুটি
ইচ্ছে হলেই...
বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন
আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা
= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত

অরণ্যের দুয়ারে

তপন পাল

-১- হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রায় যাওয়া, আর নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রায় ফেরা – এর মাঝে আমার হাতে ছিল একটি দিন – ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২। আমার শুভাকাঙ্খীরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন ওইদিন দার্জিলিং যাওয়ার; তবে আমি সবিনয়ে প্রত্যাখান করে ডুয়ার্সের দিকে যেতে চাইলাম। তাই শুনে তাদের কী হাসি; বাপ্পাদা/বাপ্পাজেঠু বুড়ো হয়ে গেছে; শীতে ভয় পাচ্ছে। কথাটা আমার আঁতে লাগল। আমি খুব একটা শীতকাতুরে তা নই, তবে কেন যেন মনে হয়, পাহাড়ে সমতলের লোকেদের না যাওয়াই ভাল। পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র অতিশয় ভঙ্গুর, পাহাড়ে পর্যটক যাওয়া মানেই সেই বাস্তুতন্ত্রের ওপর অত্যাচার। পাহাড় থাক না পাহাড়ের মত – বিশালকায়, মহিমান্বিত, দিগন্তজোড়া – দেবতাদের আর পাহাড়ি মানুষজনদের নিয়ে – সমতলের মানুষ তাকে দেখুক না দূর থেকে; শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়।

অরণ্যে হামেশাই যাই, একদা কর্মসূত্রে যেতেও হত। তবে অরণ্যে জীবজন্তু জানোয়ার দেখতে আমি আগ্রহী নই। বাড়িতে অনাহূত অতিথি এলে আমি যেমন বিরক্ত হই, অরণ্যের প্রাণীরাও নিশ্চয়ই তেমন হয়। সুন্দরবনের এক সমাজকর্মী বলেছিলেন মানুষ সুন্দরবনের বাঘ সম্বন্ধে যতটুকু জানে, সুন্দরবনের বাঘ মানুষ সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি জানে। প্রথম যৌবনে এক পিতৃবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম সুন্দরবনে বাঘশুমারির স্বেচ্ছাসেবক হতে চাওয়ার আবদার নিয়ে। তিনি 'তাহলে তোর বাপ আমায় পিটবে' বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে তার আগে একটি তথ্য দিয়েছিলেন। সুন্দরবনে গিয়ে তুমি যখন বাঘকে দেখতে পাবে, জানবে বাঘটা তার অন্তত আধঘণ্টা আগে থেকে তোমায় দেখছে।

একবার হরিদ্বারের কাছে রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে গিয়েছিলাম এক শুভাকাঙ্খীর বদান্যতায় – তিনি জিপে উঠে হাতি হাতি করে অস্থির। আমার বিরক্ত লাগছিল – হাতির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যদি ক্যামেরা খুলে নিরন্তর তাকিয়ে থাকতে হয়, তাহলে ঘরে বসে ডিসকভারি বা অ্যানিমাল প্ল্যানেট দেখলেই হত, এত পয়সা খরচ করে এতদূরে আসার কী ছিল! চওড়া পাতার পর্ণমোচী, ঘেসোজমি, নদীপারের উদ্ভিজ্জ, সরলবর্গীয় গাছ, চারপাশে এত মহীরূহ, বাতাসে তাদের পাতা নড়ছে, পড়ছে শিশিরের শব্দের মত, সরসরানি উঠছে ঘাসে, মাথার ওপরে ওলটানো বাটির মতো আকাশ, কেউ সদ্য সদ্য নীলগোলা জলে তাকে চুবিয়ে তুলেছে – এইসব না দেখে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ! মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, আমি গেছি শুনে লালমুখো বাঁদরেরা (rhesus macaque/Macaca mulatta) দল বেঁধে দেখা করতে এল; কাশির মত খক খক শব্দ করে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি রে বাপ্পা! ভালো আছিস! তোর বাবা মা ভালো আছে?' তাই শুনে এক শজারুর (Indian crested porcupine/Hystrix indica) কী হাসি!

আমার শুভাকাঙ্খীর উৎসাহ দেখে জিপচালক বললেন আপনারা বাবুজি হাতি হাতি করে লাফান; আর আমরা সব জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে ভয় পাই হাতিকে। কখন ওর মুড কীরকম থাকবে, ও যে কখন কী করবে তা কেউ জানে না। সকালে উঠে ভগবানকে বলি, 'আজ যেন হাতির সঙ্গে দেখা না হয়। আর যদি কপাল খারাপ হয়, আমি ফন্দিফিকির জানি, আমি ঠিক পালাতে পারব – আপনারা কি করবেন ভাবুন।' বলতে না বলতেই 'शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर'। আমাদের গাড়ির ঠিক সমুখে, শ'দেড়েক ফুট দূরে, একাকী এক দাঁতাল। আমার বইপড়া বিদ্যা জানে, দলছাড়া একা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতি অতীব বিপদজনক – ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ও পার্বতীবাবুরা বলেছেন। জিপচালক ডান হাত বার করে পিছনের গাড়িগুলিকে থামতে বললেন, তারা থামলেন; কিন্তু হাতি মহারাজ নড়েও না চড়েও না – রাস্তার মাঝখানে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পড়া না পারা অবাধ্য জেদি গোঁয়ার ছাত্রের মত, সূর্যালোক পিছলে যাচ্ছে তার ত্বকে। 'মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে! চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে॥ গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া, সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে॥'

নড়ান হস্তির চড়ান হস্তির গলায় দড়ি - ওরে সত্য করিয়া কনরে মাহুত কোনবা দ্যাশে বাড়িরে। ও তোমরা গিলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে'। নিম্ন অসমের লোকজীবনের গান কেমন খাপ খেয়ে গেল শিবালিকে। একটা গানের চলন কৌম ইতিহাসের চাবিকাঠি হতে পারে, তা আগে তো ভাবিনি। হাতির চলার ছন্দ আর এই গানের ছন্দে হুবহু মিল। তাহলে কি হাতির চলার ছন্দেই এই গান বাঁধা হয়েছিল?

একসময় তিনি নড়লেন, রাস্তা থেকে নেমে গেলেন নাবাল ঘেসোজমিতে, আমাদের এবং পিছনের সব গাড়ি তারপরেও দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ – কে জানে হাতি বাবাজি ঘেসোজমিতে ঘাপটি মেরে বসে আছেন কি না আমাদের জন্যে। তারপর ওই জায়গাটি সবকটি জিপ পার হল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে।

প্রায় সমতুল অভিজ্ঞতা ঘাটশিলায়। শহর পেরিয়ে অগণন টিলা আর জঙ্গল পার হয়ে বাসাডেরা গ্রাম, সেখান থেকে আদিবাসী গাইড নিয়ে চড়াই পথে জঙ্গল চিরে আধঘণ্টা হাঁটলে ধারাগিরি জলপ্রপাত। বর্ষীয়ান আদিবাসী গাইডটি সকাল থেকেই মহুয়ামাতাল, সস্নেহে বললেন কাল রাতেও হাতি বেরিয়েছিল। হাতির মুখোমুখি পড়লে কি করতে হবে তাও সে বিমানবালিকাদের সিকিউরিটি ড্রিলের মত পাখি পড়া করে বুঝিয়ে দিল, ঝাঁপ দিয়ে পাশে সরে যেতে হবে, কোনক্রমেই হাতির যাত্রাপথে থাকা চলবে না। শুনে অপার নিস্পৃহতায় আমি হাসলাম; বিমানবালিকাদের অঙ্গভঙ্গি আমি কোনওদিন দেখি না, বকবকানি শুনি না। আমি ঠিকই করে নিয়েছি যে কিছু হলে সিটেই বসে থাকব, যা হওয়ার হোক; কারণ শুনেছি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ মেলে। এক্ষেত্রেও শুনলাম না; যা হওয়ার হোক। 'তাই হোক তবে তাই হোক, রূপের অতীত রূপ দেখে যেন প্রেমিকের চোখ – দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক॥'

অরণ্য আমার 'প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তি'।

-২-

রাতটা ছিলাম জলপাইগুড়ির এক হোটেলে। সাতটায় এক রেলতুতো ভাই এলেন, তার দ্বিচক্রযানের পিছনে বসে দেখতে বেরোলাম ভারি প্রিয় এই জলশহর। প্রথমে গেলাম হলদিবাড়ি নিউ জলপাইগুড়ি লাইনের জলপাইগুড়ি স্টেশনে। স্টেশনটি অতি প্রাচীন; ১৮৭৮ সালে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হাতে এর স্থাপনা। দার্জিলিং মেল একদা এখান থেকেই ছাড়ত। স্টেশনটিতে দুটি প্ল্যাটফর্ম, আর চারটে লাইন। একদা পদ্মার উত্তর পাড়ের সারাঘাট থেকে শিলিগুড়ি রেল চলত এই পথে। ১৯১২ সালে হার্ডিঞ্জ সেতু চালু হওয়ার পরে ১৯২৬ এ শিয়ালদহ রানাঘাট ভেড়ামারা হার্ডিঞ্জ সেতু ঈশ্বরদি সান্তাহার হিলি পার্বতীপুর নিলফামারি হলদিবাড়ি জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি পুরো পথটিই ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়। আমরা থাকতে থাকতেই ৭৫৭২২ হলদিবাড়ি শিলিগুড়ি ডেমু ঢুকল, মিনিট তিনেক দাঁড়াল।

এবারে আমরা গেলাম সাহেবঘাট। এইখানে করলানদীর ওপর দিয়ে ফেরি চলত; Eastern Bengal State Railway ও Bengal Dooars Railway-র যোগসূত্র ছিল সেই ফেরি। তারপরে দেখলাম উদাসিনী তিস্তাকে, আর করলাকে।

তারপর বৈকুন্ঠপুর রাজ এস্টেট। রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো এবার পাঁচশ তেরো বছরে পড়ল। হোটেলে ফিরে প্রাতরাশ।

বৌদ্ধ গ্রন্থ 'খুদ্দ নিকায়' (Minor Collection। থেরাবাদী বৌদ্ধদের অতীব মান্য গ্রন্থ। ত্রিপিটকের সুত্ত পিটক অংশের পঞ্চম ভাগ। খুদ্দক শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। নামে ক্ষুদ্র হলেও এর আয়তন বেশ বড়)-তে গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, সংসার আর সম্পত্তি ছেড়ে যদি সাধনা করতে হয়, তাহলে গণ্ডারের মত একা একা চরে বেড়াও – 'একো চরে খগগবিষাণ–কপ্পো'। সোমবার সকালে তাই একটা গাড়ি নিয়ে একা একা বেরিয়ে পড়লাম পূর্বদিকে; তিস্তার সঙ্গে একবার দেখা না করলেই নয়। অনেকের মতো ডুয়ার্স আমারও অনেকখানি আবেগ আর তার চেয়েও বেশি ভালোবাসার জায়গা। এতদুরে এসে ময়ূর বানর পাখপাখালি আর গউরের সঙ্গে দেখা না করলে চলে? ১৯৮৪তে আমাদের মধুচন্দ্রিমার পয়সা নেই শুনে অগ্রজ সহকর্মীরা প্রভাব খাটিয়ে গরুমারা, জলদাপাড়া, লাটাগুড়ি, চালসা বনবাংলোয় বিনিপয়সায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি 'এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে কুহেলিকায় মন্থর কোন্ মৌন সমীরণে'। এই উত্তর-প্রৌঢ়ত্বে, হাত পা সচল থাকতে থাকতে ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই একবার তার সঙ্গে দেখা করে নেওয়া দরকার।

সেখান থেকে ১৫৬৩৩ বিকানির গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার জন্য খ্যাত দোমহনি। সেখানকার রেললাইনের Y Link Layout দেখলাম, তারপরে স্টেশন। পূর্বতন Bengal Dooars Railway (১৮৯১ -১৯৪১) এর সদর ছিল শান্ত, স্থিতধী এই স্টেশন। স্টেশনের পাশেই এক সাবেকি ট্রলি শেড।

পরবর্তী বিরতি নেওড়া নদীর তীরে ৭১৭ জাতীয় সড়কের ওপরে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের খুব কাছে প্রকৃতি পর্যটনকে নিয়ে বেড়ে ওঠা ডুয়ার্স পর্যটন রাজধানী লাটাগুড়ি। শহরে একটি 'প্রকৃতি তথ্যকেন্দ্র' (Nature Interpretation Center) রয়েছে, যেখানে স্থানীয় প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত। গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ি মডার্ন নার্সারির প্রতিষ্ঠা ১৯৯২ সালে। উত্তরবঙ্গের ত্রিশ প্রকারেরও অধিক ভেষজ উদ্ভিদ এখানে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। শুনলাম এইখানে এমন কিছু ভেষজ পাওয়া যায় যা অদ্যাবধি বিজ্ঞানসম্মত পরিচয়প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। আছে একটি ডিয়ার পার্ক। পর্যটন আকর্ষণ বৃদ্ধি ও ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে গত কয়েক বছর ধরে লাটাগুড়িতে শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি উৎসব ও ডুয়ার্স প্রকৃতি-পর্যটন মেলা।

একদা লাটাগুড়ির অর্থনীতি ছিল কাঠের ব্যাবসা নির্ভর। এলাকায় ছিল অগুন্তি করাতকল, প্লাইউডের কারখানা। রেলের স্লিপার ও বিদ্যুতের খুঁটিও তখন লাটাগুড়ি থেকে সরবরাহ করা হত। ১৯৮০ সালে বন সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ায় এই ব্যাবসার বিপদ ঘনায়, মিলগুলি বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমিকরা কাজ হারায়। সেখান থেকে লাটাগুড়ির অর্থনীতি আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি পর্যটন (ইকো ট্যুরিজম)কে আঁকড়ে। অতীতের মিলমালিকেরা অনেকেই রিসর্ট খুলেছেন; এলাকার অনেক যুবক গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন, গাইডের কাজ করছেন – এছাড়া পর্যটনকে কেন্দ্র করে চলছে নানা

লাটাগুড়ি সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে এসেছে জ্যান্ত পেত্নি ধরে। লাটাগুড়ি মালবাজার রাস্তায় রাতে ভূত ঘোরে, এমন গুজব অনেকদিনের, অনেকেই দাবি করছিলেন তারা ভুত দেখেছেন। সৌভিক ভট্টাচার্য নামের এক পর্যটক সড়কপথে মালবাজার থেকে লাটাগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ির সামনে ভুত দেখে গাড়ি থামাতেই ভুত গাড়ির বনেটের ওপর লাফ দেয়। আওয়াজ করে ভয় দেখায়। অপ্রতিভ না হয়ে সৌভিক হাতেনাতে ধরে ফেলেন জ্যান্ত ভুতকে। দেখা গেল পাতলা চেহারার এক মহিলা সাদা থান পরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠে এসে ভয় দেখাচ্ছেন। তাকে দেখে পালিয়েছে অনেকেই। কিন্তু কেন এহেন কাণ্ড ঘটাচ্ছিলেন ওই মহিলা? স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়ি চুরির লক্ষ্যেই নাকি এই ভুতুড়ে কাণ্ড।

'কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। বাঁধি নীড় থাকে সুখে।' তেমনি উচ্চ চূড়ে দেখা মিলল কতিপয় শকুনের (white-rumped vulture, Gyps bengalensis)। প্রজাতিটি আমার ভারি প্রিয়, কারণ আমার মতই এরা বুদ্ধপন্থী অহিংস, কদ্যপি জীবিত কোন প্রাণীকে আক্রমণ করেন না। ক্রমিক diclofenac poisoning-এর ফলে কিডনি অচল হয়ে হয়ে প্রজাতিটি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে; International Union for Conservation of Nature (IUCN) এর Critically Endangered তালিকাভুক্ত। অথচ ১৯৮৫তেও কেম্ব্রিজের International Council for Bird Preservation ভেবেছিল এরা 'the most abundant large bird of prey in the world'। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি গবাদিপশুর জন্য এই ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে সরকারকে রাজি করায়। এরপর শকুনের সংখ্যা স্থিতিশীল হতে শুরু করে, এবং কিছু কিছু জায়গায় তাদের সংখ্যা বাড়তেও শুরু করে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজনন কেন্দ্র এক্ষেত্রে দিগদর্শক।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে বাতাবাড়ি হয়ে মূর্তি, পাথর বিছানো নদীবক্ষ – হাজারে হাজারে ছোট বড় পাথর। তাদের ওপর দিয়ে, নিচ দিয়ে, পাশ কাটিয়ে স্বচ্ছতোয়া মূর্তির চলন। পাথরের বাধায় উৎসারিত জলে বিকীর্ণ হচ্ছে ফেনা, রামধনু। আক্ষরিক অর্থেই মূর্তির 'পথে পথে পাথর ছড়ানো। তাই তো তোমার বাণী বাজে ঝর্না-ঝরানো'। পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে নদীর সঙ্গে দেখা; সাহসীরা তারপরেও পাথর ভেঙে, জলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যান মাঝনদীতে কোন বড় পাথরের ওপর – নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকেন, সেলফি তোলেন; পাথরটাই যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ – তাদের দু পাশ দিয়ে নদী বহমানা। এখানে ঘড়িয়াল (মেছো কুমির Gharial, Gavialis gangeticus বিরল প্রজাতির মিঠাজলের কুমিরবর্গের সরীসৃপ) অতিখ্যাত। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ঘড়িয়ালের নাকের ডগার আকৃতি ঘড়ার মত, জলের ওপর এইটুকুই জেগে থাকে। তাই এমন নাম। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ঘড়িয়াল কুড়ি ফুট অবধি হতে পারে; মহিলা ঘড়িয়াল আট থেকে চোদ্দ ফুট। ইস্কুলজীবন থেকেই আমি সিনেমার পোকা। সেই যুগে ফরিয়াল নামে হিন্দি সিনেমার এক প্রতিনায়িকা ছিলেন। জুয়েল থিফ (১৯৬৭), সাচ্চা ঝুঠা (১৯৭০), ঝিল কে উস পার (১৯৭৩) যারা দেখেছেন, তারা হয়তো আজও তাকে মনে করতে পারবেন। কেন জানি না, বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল ঘড়িয়াল কোনভাবে ফরিয়াল এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আকাশ আকাশ নীল, ঘুরে ফেরে একা চিল; ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় শামুকখোল (Asian Openbill, Anastomus oscitans), গিরিয়া হাঁস (Garganey, Spatula querquedula), দেশি মেটেহাঁস (Indian spot-billed duck, (Anas poecilorhyncha); নদীর জলে পাথরের উপরে বসে জল থেকে খাবার জোগাড় করে Plumbeous water redstart (Rhyacornis fuliginosus)। পুরুষদের গায়ের রং নীল, লেজ মরিচা রঙের; স্ত্রী পাখিদের রং ধূসর। এদের

প্রিয়। যখন চাকরি করতাম, এখানে অনেকবার এসেছি। চাকরিটি যাওয়ার পর কখনও ভাবিনি আবার এখানে আসা হবে। অথচ হল তো!

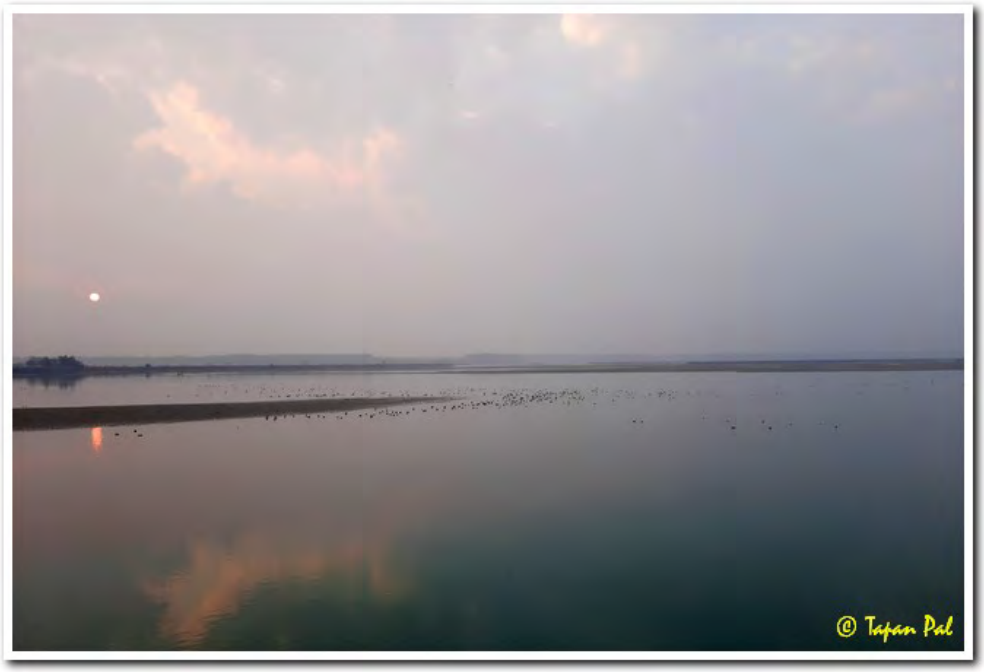

সেখানে চা খেয়ে মূর্তি নদীর ব্রিজ পেরিয়ে খুনিয়া মোড়। সেখান থেকে নাগরাকাটা পথ গিয়েছে গরুমারা চাপড়ামারি অরণ্যের মধ্য দিয়ে। ময়ূর, বাঁদর আর বনমুরগির দেখা মিলল। নাগরাকাটার জলঢাকা সেতুর গায়ে নদীবক্ষে গজিয়ে উঠেছে হৃদয়াকৃতির এক চড়া - লোকমুখে নাম পেয়েছে লাভ আইল্যান্ড। জলঢাকা আন্তঃসীমান্ত নদী; দক্ষিণ-পূর্ব সিকিমে উৎপন্ন হয়ে ভুটানে, সেখানে তার নাম দিচু, মানসাই আর সিঙ্গিমারি। ভারতে ঢুকে তারপর বাংলাদেশে; সেখানে তার নাম ধরলা। কুড়িগ্রামের কাছে ব্রহ্মপুত্রে তার সমাপ্তি।

সেখান থেকে চা বাগানের মধ্য দিয়ে অনেকখানি পথ হেঁটে রেললাইন, তীব্র এক বাঁক নিয়ে সে উঠে গেছে সেতুতে। বসে রইলাম ১৫৪৮৩ আলিপুরদুয়ার দিল্লি সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস দেখার আশায়। রেললাইন ধরে লোকজন কাঠ বয়ে আনছে, সংরক্ষিত অরণ্যের চোরাই কাঠ – তবু এদের চোর বলতে যেন বাধে – এদের কঠোর পরিশ্রমটুকু তো উপেক্ষণীয় নয়। সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস দেখে চাপড়ামারি সংরক্ষিত অরণ্যের ভিতর চাপড়ামারি রেলগেটে; হাতিরা এখানে

সেখান থেকে চালসা। চালসা মেটেলি Bengal Dooars Railway-র রেল চলার সূত্রপাত ১৯১৮য়। সেই রেললাইন হারিয়ে গিয়েছে অরণ্যে। ভিউ পয়েন্ট থেকে পাহাড় আর জঙ্গল – যখন চাকরি করতাম, এদিকপানে প্রায়ই আসতে হত। সেই সূত্রে এই জায়গাটি আমার ভারি প্রিয়। সেখান থেকে নিউ মাল – চ্যাংড়াবান্ধা – নিউ কুচবিহার লাইনের মালবাজার স্টেশন। অবৈদ্যুতায়িত, একটিই প্ল্যাটফর্ম – সারাদিনে চারটি রেলগাড়ি চলে।

রেলস্টেশন দেখে মালবাজার বাস টার্মিনাস, সেখানে বরোলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত। খেতে খেতে আলাপ হল স্থানীয় শিক্ষক সব্যসাচী ঘোষ মহোদয়ের সঙ্গে। তিনি জালালেন রেলকলোনির ভিতরে রেলের কিছু অতি পুরাতন বাড়িঘর আছে। আমরা সেগুলি দেখতে গেলাম। মালবাজার আলো ঝলমল ঝাঁ চকচকে শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট ও দূষণমুক্ত পর্যটকপ্রিয় শহর; এখান থেকেই অনেকে ডুয়ার্স ভ্রমণ শুরু করেন। হাতি ও বাইসন (গউর, Gaur, Indian Bison, Bos gaurus)-এর উৎপাতের জন্য প্রসিদ্ধ। 'মাল পার্ক' টি চমৎকার। বনভোজনের জন্য এখানে আছে 'কুমলাই পিকনিক স্পট'।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে, চা-বাগানের গা ঘেঁষে, জানা-অজানা নদী ও ঝোরা পার হতে হতে বাগরাকোট চা বাগান। গাড়ির

দুর্দশা নিয়ে সংবাদপত্রে প্রায়ই দীর্ঘ নিবন্ধ পড়ি। বামপন্থী বন্ধুরা প্রায়ই বোঝাবার চেষ্টা করেন চা-বাগানের শ্রমিকরা কতখানি বঞ্চিত, শোষিত, নিষ্পেষিত। তবু সেই সীমায়িত আয়ের মধ্য থেকেই অপরাপর খরচ কমিয়ে তারা লটারির টিকিট কাটেন! আশ্চর্য! আমি তো বিগত তিরিশ বছরে লটারির টিকিট কেটেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

বাগরাকোট থেকে নাথুলা যাবার নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নীল আকাশের নিচে সবুজ গালিচা, সজীব প্রকৃতি; টিলা আর সমতল।

শিলিগুড়ি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে তিস্তা নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে ওদলাবাড়ি অঞ্চলের ছোট্ট গ্রাম গাজলডোবায়। তিস্তা এখানে শান্ত, বিস্তৃত; দূরে পাহাড় আর অগণন পাখি। উত্তরবঙ্গের এটিই নবতম পর্যটন গন্তব্য – ঠিক যেভাবে মিরিক গড়ে উঠেছিল সাতের দশকে। গাজলডোবায় তৈরি হচ্ছে ইউথ হস্টেল, রিসর্ট, আয়ুর্বেদিক ভিলেজ। ২১০ একর এলাকায় ইতিমধ্যেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য পূর্ত দফতর তিনটি রাস্তা তৈরি করছে জাতীয় সড়কের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। এছাড়া গোটা এলাকায় বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে একটি পাওয়ার স্টেশন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। গ্রামের পাশেই বৈকুন্ঠপুর বন। সেখানে নাকি কৃষ্ণ আর রুক্মিণী কিছুদিন ছিলেন, অনেকেই দেখেছেন! সেই স্মৃতিতে ইস্কন এক মস্ত মন্দির বানিয়েছে।

তবে গাজলডোবার খ্যাতি তার পক্ষীকুলের নিমিত্ত। নভেম্বরের শুরু থেকেই এখানে আসতে শুরু করে মালাড, গ্রেল্যাগ গুজ, নর্দার্ন ল্যাপউইং, কমন মারগ্যানজার, নর্দার্ন শোভেলার। ভারতে যত প্রজাতির পরিযায়ী হাঁস আসে, তাদের সব ক'টি প্রজাতিকেই নাকি এখানে দেখা যায়। যাঁরা তিস্তায় মাছ ধরেন, তাঁরাই নৌকা করে পাখি দেখাতে নিয়ে যান, নিয়ে যেতে যেতে তারাই এখন গাইড। পাখিদের নাম তাঁদের কণ্ঠস্থ, কোন পাখির ঝাঁক কোথায় থাকতে পারে, তাও তাদের জানা। নৌকাগুলি অতি সরু; ছপছপ আওয়াজ ওঠে, জলে চিকচিকে রোদ, মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় হাঁসের ঝাঁক। হোগলা বনের ফাঁকে ডিঙিনৌকা, হাওয়ায় জেলেদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে। দাঁড় টেনে এগোতেই দেখা মিলল ব্রাহ্মণী হাঁসের (Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea), Northern Pintail (Anas acuta), Mallard (Wild Duck,Anas platyrhynchos)। এক সময়ে নৌকা এসে থামল চরে। সেখানে ঘুরে বেড়ায় কাস্তেচরা (Red-naped Ibis, Pseudibis papillosa), River lapwing (Vanellus duvaucelii), Little ringed Plover (Charadrius dubius), Northern lapwing (Vanellus vanellus), Common shelduck (Tadorna tadorna), সরাল lesser whistling duck (Dendrocygna javanica), European Sand Martin (Riparia riparia). Grey-headed Lapwing (Vanellus cinereus), ডুবুরি হাঁস (Little Grebe,Tachybaptus ruficollis), Eurasian Teal (Anas crecca), Tufted Duck (Aythya fuligula), লাল কাঁক (Purple Heron, Ardea purpurea), Western Osprey (Pandion haliaetus), Bar-headed Goose (Anser indicus), ইউরোপিয়ান নীলকণ্ঠ (European Roller, Coracias garrulus), ইউরেসিয়ান বউ কথা কও (Eurasian Golden Oriole, Oriolus oriolus), Eurasian wigeon, (Mareca penelope), Northern Lapwing (Vanellus vanellus), Graylag Goose (Anser anser), হলুদ খঞ্জন (Citrine wagtail, (Motacilla citreola), কুরচি বক (Little Egret, Egretta garzetta), Wood Sandpiper (Tringa glareola), Common Sandpiper (Actitis hypoleucos), পানকৌড়ি (Great Cormorant, Phalacrocorax carbo), বড় পানকৌড়ি (Oriental Darter, Anhinga melanogaster), বেলে বগেরি (sand lark (Alaudala raytal); সাইবেরিয়া রাশিয়া, কোরিয়া জাপান থেকে উড়ে এসেছে ছোট্ট Siberian Stonechat (Saxicola maurus), কেলে কসাই (Long-tailed Shrike/ Rufous-backed Shrike, Lanius schach), Olive-backed Pipit (Anthus hodgsoni), Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)।

সেখান থেকে করোনেশন সেতু, ১৯৩৭-এ রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেকের স্মারক, চার লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি এই সেতু চালু হয়েছিল ১৯৪১ সালে। উন্মত্তা তিস্তার বুকে কোন স্তম্ভ নেই, পুরোটাই ঝুলন্ত। স্থানীয়দের কাছে এই সেতু বাঘ পুল, কারণ সেতুর একমাথায় দুটো বাঘের মূর্তি আছে। ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগের মূল মাধ্যম সেতুটির পিলারের মাটি সরে গিয়েছিল বহুদিন আগে। ২০১১ সালের ভূমিকম্পে সামান্য ক্ষতির পর এই সেতুর উপর দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পিলারের নিচে পাথর বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। তিস্তার জল যাতে পিলারের আর ক্ষতি করতে না পারে, সেই জন্য পিলারের চারপাশে পাথর এবং লোহার জালি বসানো হচ্ছে। পর্যটনের স্বার্থে এই সেতুর সংরক্ষণ ও শিলিগুড়ির সাথে ডুয়ার্সের যোগাযোগ নিবিড় করতে তিস্তার উপর দ্বিতীয় এক সেতু – এই দুই দাবিই উঠতে শুরু করেছে।

১৮৫৮ সালে ডুয়ার্সে চা বাগান গড়ে ওঠা শুরু হয়। চল্লিশ বছরের মধ্যে তিস্তার পার থেকে সঙ্কোশ নদী পর্যন্ত শতাধিক চাবাগান গড়ে ওঠে – তাল মিলিয়ে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হয়। তখন আজকের শিলিগুড়ি ছিল না; চিকিৎসা, শিক্ষা, চাবাগানের সমস্যা সব কিছুর জন্য প্ল্যান্টার্সদের ছুটতে হত দার্জিলিংয়ে। ফুলবাড়ি ঘাট দিয়ে তিস্তা পেরিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং যেতে হতো। মালবাজার শহরের ব্যবসায়ী সিং পরিবার ছিলেন এই ঘাটের ইজারাদার। ১৯২৫ সাল নাগাদ ডুয়ার্সে চায়ের উৎপাদন বাড়ে। জমির পত্তনি নিয়ে গড়ে ওঠে একের পর এক চা বাগান। তিস্তার পার বরাবর শিলিগুড়ি থেকে গেলিখোলা ন্যারো গেজের রেললাইন ততদিনে চালু হয়ে গেছে। সেই রেলপথে মালপত্র এনে ১৯৩৭ সালে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ষাটের দশকে খ্যাতনামা রেল ইতিহাসবিদ ও কার্টোগ্রাফার জন গিলহ্যাম সাহেব দার্জিলিং রেলপথের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানে এই লাইনটি দেখানো আছে। তিনি এই লাইনে শালুগাড়া নামের একটি স্টেশনের উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, সেই সময়কালের সময় সারণিতে ওই স্টেশনের কোন উল্লেখ নেই। এই

অতঃপর সেবকের জঙ্গল, সরলবর্গীয় উন্নতশির বৃক্ষরাজির পাশাপাশি শাল-সেগুনের ছায়াময় মায়াময় রাস্তা – বাতাস হিমেল। বাংলা-সিকিম সংযোগকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ সেবক রোড ধস নামার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ধস নামলেই সিকিমের রাস্তা বন্ধ, বন্ধ শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স এবং কালিম্পং যাওয়ার রাস্তাও। জঙ্গল শেষ হলেই অনুপমা তিস্তা দুই পাহাড়ের মাঝে সবুজ জল বুকে নিয়ে – আর রুপোলি রেল সেতু।

ধর্মহীন ভ্রমণব্যসনে বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্তের মননে কোথায় যেন মিশে থাকে কিঞ্চিৎ অপরাধবোধ। বিধানবাবু যখন মাইথনে শ্রমিক পর্যটন আস্তানা বানিয়েছিলেন, তখনও কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের অনুষঙ্গ ঝেড়ে ফেলা যায়নি। দীঘা নেহরু মার্কেটে কালীমন্দির বানাতে তবে লোকে যেতে শুরু করলো। এভাবেই, বছর দশ বারো আগে তিনশো ফুট উচ্চতায় গজিয়ে উঠেছে সেবকেশ্বরী কালী। তার মাহাত্ম্য প্রচারে সন্তানকুল উচ্চকিত, পঞ্চমুখ। ভক্তিভরে ডাকলে মা নাকি কাউকেই ফেরান না। কবে এখানে পুজো শুরু, তা নাকি কারোরই জানা নেই; সম্ভবত টেথিস সাগর থেকেই তার উত্থান। এখান থেকেই নাকি পঞ্চমুন্ডি আসন, বেদি আর ত্রিশূল পেয়েছিলেন এক সাধক ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা পাহাড় ঘুমিয়ে পড়লেও 'সেবকেশ্বরী মা' নাকি জেগে থাকেন; তাই অমাবস্যার রাতে এখানে বিপুল জনসমাগম, পাহাড়ে নাইট লাইফ বলতে বিশেষ কিছু নেই কিনা! এসব গল্প শুনলেই আমার হাই ওঠে। তবে পাহাড়ের গায়ে এমন কালীমন্দির এরাজ্যে সম্ভবত বিরল। সম্প্রতি আবার উত্তরবঙ্গের তিনটি মন্দির — ভ্রামরীদেবী মন্দির, সেবক কালীবাড়ি এবং দেবী চৌধুরানী মন্দির – নিয়ে একটি নতুন পর্যটন সার্কিট তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন।

তিব্বতি লামা কালু রিনপোচে শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠা করেছেন মস্ত এক মঠের। শালুগাড়া মঠ (আন্তর্জাতিক তাশি গোমাং স্তুপ) শহরের মধ্যেই, সেনাছাউনির পাশেই। দলাই লামার অনুগামীদের দ্বারা নির্মিত মঠটির পরিচালনাভার Droden Kunchab Chodey Buddhist Association-এর হাতে। মঠের স্তূপটি একশো ফুট, বৌদ্ধধর্মের পাঁচরকম পবিত্র স্মরণচিহ্ন এখানে সংরক্ষিত।

ঘেরা মঠ, বাইরের প্রাচীরে বুদ্ধের ধ্যানরত চিত্রণ, ভিতরে কাঠের মেঝে, অনুগামীদের জন্য প্রার্থনার আসন পাতা। মঠাভ্যন্তরে এক ছোট ঘরে মাখন প্রদীপ জ্বালাবার বন্দোবস্ত, চমরী গাইয়ের দুধের মাখনও উপলব্ধ। তার পাশেই এক মস্ত বড় প্রেয়ার হুইল। তিব্বতি ধূপের গন্ধে বাতাস ভারি, ওঁ মণিপদ্মে হুঁ মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত। দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে শান্তি ব্যাপ্ত চারিদিকে। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ পরম করুণাময় অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশে উচ্চারিত তিব্বতি মহাযান বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতম মন্ত্র। ছোট ছোট চিরকুটে এই মন্ত্র লিখে তা প্রার্থনা চক্রের মধ্যে ভরে দেওয়া তিব্বতের চিরন্তন ঐতিহ্য। পঞ্চাশ বছর আগেও তিব্বতি জীবনযাত্রা জীবনচর্যা নিয়ে জানতে হলে কালিম্পং যেতে হত। এখন তা শিলিগুড়িতেই পাওয়া যাচ্ছে।

রোমাঞ্চকর বেঙ্গল সাফারি এর কাছেই। কাছেই হার্বাল পার্ক ও শালুগাড়া বিট অফিস।

পরিশেষে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন। পাঁচটি ব্রডগেজ প্ল্যাটফর্ম, একটি ন্যারোগেজ। নিউ জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার শামুকতলা রোড, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ও কাটিহার শিলিগুড়ি লাইন সমূহের প্রাণকেন্দ্র এই শিলিগুড়ি জংশন (Station Code SGUJ)। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে এর পথ চলা শুরু; বৈদ্যুতায়িত ২০২০ তে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের লোকজনের সৌজন্যে তাদের লোকো শেড ও ওয়ার্কশপ দেখা হল।

রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন (Station Code SGUT)। দু ফুটের ন্যারোগেজ ও সাড়ে পাঁচ ফুটের ব্রডগেজ – সঙ্গে স্মারকরূপে কিছুটা মিটারগেজ লাইন। দুটি ব্রডগেজ প্ল্যাটফর্ম, একটি ন্যারোগেজ। North Bengal State Railway-র এই স্টেশনের পথ চলা শুরু ১৮৮০-তে, বৈদ্যুতায়িত ২০২০-তে। স্টেশনের গায়ের হকার্স কর্নার চিরে ন্যারোগেজ লাইন হ্যানয়ের Train Street বা থাইল্যান্ডের Maeklong Railway Market এর কথা মনে পড়ায়। দার্জিলিং মেল একদা এই স্টেশন থেকেই ছাড়ত।

তারপর ভুটিয়া মার্কেট ও হংকং মার্কেট। কেনাকাটা সেরে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন স্টেশন দুটোয়। ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রা তিনটে পাঁচে, আমাদের কামরা ই ২, এক্সেকিউটিভ শ্রেণিতে। সারা রাস্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, শুধু রাতের খাওয়া দেওয়ার সময় এক পিসিমা আমিষ ও নিরামিষ আহার্য কেন একসঙ্গে আনা হচ্ছে তাই নিয়ে তুমুল হইচই জুড়লেন – আর তাই নিয়ে সারা কামরায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ঝড় উঠল, এক নব্য যুবা দাবি করলেন তার মাতাঠাকুরানি নাকি মুরগি রেঁধে কড়ায় একটি তুলসিপাতা ফেলে দেন। হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল মন্তব্যেরা। হাওড়া সাড়ে দশটায়।

মধ্যেই রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা - কেউ কি কখনও প্রশ্ন করেছে কী ধান দাদু, আমন না আউশ না বোরো; তাই থেকে কী চাল হবে, দুধেশ্বর না মিনিকিট, লোহু না বাঁশকাঠি।

কবিরা লিখেই খালাস, প্রামাণ্যতা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমরা যারা বেড়িয়ে এসে গুগল টাইমলাইন দেখে দেখে বিস্তর গুলগাপ্পা দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার গল্প লিখি, তাদের মহা জ্বালা। বিন্দুমাত্র তথ্যগত ভ্রান্তি থাকলেই সতর্ক পাঠক চেপে ধরে, 'কী মশাই, শিলিগুড়ি বাজারে দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে কুমড়ো কিনতে কিনতে আপনি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলেন কী করে!'

তাই বলছি, ঝটিকা সফর কাহিনিটিতে কেউ কোন তথ্যগত ভ্রান্তি দেখলে জানাবেন। শুধরে নেব।

২। পাখিদের বাংলা নাম মাঝিদের থেকে সংগৃহীত, ইংরাজি ও বৈজ্ঞানিক নাম আমার সংযোজন। উল্লিখিত সব পাখিই আমি দেখেছি এমনটি কিন্তু নয়।

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

আমাদের ছুটি
ইচ্ছে হলেই...
বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন
আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা
= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে

এক টুকরো তিব্বত

প্রজ্ঞা পারমিতা

তিব্বত দেখতে ইচ্ছে যায়? গেলেই হয়! ওই তো – কলকেতা, ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর, তারপরেই তিব্বত – ব্যাস। হ্যাঁ, একটু অন্য পথে এই যা। এখন আপনি যদি সহসা এক জায়গায় হাজার হাজার তিব্বতিদের একত্র অবস্থান দেখতে পান, পথেঘাটে দোকান-বাজারে সর্বত্র, তাহলে এমন মনে হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয় যে বুঝি বা তিব্বতে হাজির হলাম! শুধু তো মুখ নয় - তিব্বতি বৌদ্ধ মঠ, মন্দির, শিল্পবস্তু, খাদ্য - কী নেই সেখানে! সাধে আমার কর্ণাটকের বায়লাকুপ্পে গিয়ে মনে হয়েছিল এ যেন হযবরল-এ বাতলানো সিধে রাস্তায় তিব্বতে পৌঁছে যাওয়া।

আশপাশের অনেকটা এলাকাসহ এই বায়লাকুপ্পে গ্রামটি হল তিব্বতের বাইরে দ্বিতীয় বৃহত্তম তিব্বতি বসতি, ধরমশালা যেখানে প্রথম। তাই এই অঞ্চলে না জেনে ঢুকে পড়লে চমক লাগবে, মনে হবে দাক্ষিণাত্যের সমতলে এত পাহাড়ি মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ এল কী করে! একটু খোঁজ নিলেই মুখগুলির পিছনের ইতিহাস স্পষ্ট হবে। ওরা সবাই দেশ-হারানো মানুষ অথবা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। চিন যখন তিব্বতকে জোর করে বগলদাবা করে নেয়, তখন যে সব তিব্বতি পালিয়ে আসে ভারতে তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় এই বায়লাকুপ্পে এলাকায়। ১৯৯৮ সালের হিসেব অনুযায়ী এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার তিব্বতির বাস। ঘর-হারানো মানুষেরা মাথায় মনে স্বদেশের স্মৃতির ভার বয়ে বেড়ায়। একটু থিতু হওয়ার অবসর পেলেই তারা নিজের চারপাশে ফেলে আসা দেশের ছায়ায় ঘরদুয়ার, উপাসনালয় ইত্যাদি গড়ে তোলে। এখানেও তেমনই ঘটেছে। তাদের তৈরি করা অসাধারণ সুন্দর বৌদ্ধ মঠ, ধর্মগুরুর স্মৃতি মন্দির ইত্যাদি কর্ণাটকের পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে অতঃপর।

মাইসোর থেকে ঘণ্টা পাঁচেক দূরত্বে কুশলনগর শহর যাকে কেন্দ্র করে বায়লাকুপ্পে ঘুরতে হয়। বায়লাকুপ্পের ভৌগোলিক অবস্থান মহীশুর ও কোদাগু জেলার সীমারেখার উপর। মাইসোর-মারকারা হাইওয়ের উপর টিবেটান সেটলমেন্টটা যে অংশে সেটা মাইসোর জেলায় পড়ে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে গেলে ঢুকতে হবে কুশলনগর দিয়ে যেটা আবার কোদাগু বা সাবেক কুর্গ জেলায়। কুর্গ ভ্রমণার্থীরাই প্রধানত যাতায়াতের পথে নামদ্রোলিং মনাস্ট্রি দেখতে আসেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দুবার যাওয়ার। প্রথমবার শীতে, দ্বিতীয়বার বর্ষায়। যে কোনও সময় চোখ ধাঁধিয়ে মন ভরিয়ে দেবে এই ঠিকানাটি।

নামদ্রোলিং বৌদ্ধ বিহার চত্বরে ঢুকে অনেকটা উন্মুক্ত পরিসরে দুপাশে কেয়ারি করা বাগান ও সবুজ ঘাসের মাঝখান দিয়ে গিয়ে প্রথমে চোখে পড়বে জাং থো পেলরি মন্দির। হ্যাঁ, এটি মঠ নয় মন্দির যা তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মে স্বর্গের রূপক। আমি যতদূর জানি ভারতে জাং থো পেলরি মন্দির এই একটি মাত্রই আছে। কোনও বৌদ্ধবিহার-সংলগ্ন এই মন্দির একমাত্র নিংমা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। বজ্রযান মতাবলম্বীদের বিশ্বাস মহাসিদ্ধ যোগীরা মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মাঝের সময়টা এই স্বর্গে অবস্থান করেন। কথিত যে গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতে তাঁর আরব্ধ কাজ বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাম্র-পর্বতে তাঁর মহিমময় স্বর্গে ফিরে যান। মহাজাগতিক সমুদ্রে এক মণ্ডলাকৃতির দ্বীপে একটি ত্রিতল মন্দিরে তিনি বিরাজ করেন। প্রথমতলে গুরু পদ্মসম্ভব, যাঁর তিব্বতি নাম রিনপোচে। দ্বিতীয় তলে অবলোকিতেশ্বর, যাঁর তিব্বতি নাম চেনরেজিগ এবং সর্বোচ্চ তৃতীয় তলে অমিতাভ বুদ্ধ অবস্থান করেন। জাং থো পেলরি হল সেই স্বর্গীয় মন্দিরের প্রতিরূপ।

দেখলাম মন্দিরের একতলার চারদিকে চারটি প্রবেশ দ্বার। একতলাটি সমবেত ধ্যানের জায়গা রূপে ব্যবহার হয় যদি না বিশেষ কারণে দ্বার রুদ্ধ থাকে। একতলার ওপরে ধাপে ধাপে ছোট হয়ে যাওয়া তিনতলা অপূর্ব কারুকাজ করা প্যাগোডা শৈলীর মূল মন্দির। সবচেয়ে ওপরে একটি রামধনু-রঙা চক্র যার গায়ে অসংখ্য নৃত্যরত মূর্তি। মন্দিরের গাত্রে তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে জড়িত নানা কাহিনি ও চরিত্রের অলংকরণ দেখলাম, দেখলাম বহু সংখ্যক না-মানুষের মূর্তির সারি। আমার একটি স্পোর্টস গ্লাস আছে। সেইটি সম্বল করে বিস্ফারিত চোখে যতটা সম্ভব দেখে গেলাম। নীল, সোনালি ও সামান্য সাদা - তিন রঙের ব্যবহার স্থাপত্যটিকে এমন এক তীব্র সৌন্দর্য এনে দিয়েছে যে প্রথম দর্শনে মনে হয় চোখ দুটি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেল।

আমি প্রথম যেবার যাই, গুরু পেনর রিনপোচের পার্থিব শরীর সমাধিস্থ হওয়ার অপেক্ষায় একতলার কক্ষটিতে রাখা ছিল। সেইসময় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল সেখানে। ২০১৩ সালের ২৩ মে তাঁকে স্তূপ-সমাহিত করা হয়। তাঁর প্রসঙ্গে পরে জানাচ্ছি। দ্বিতীয় ভ্রমণে এই মন্দিরের একতলা উন্মুক্ত পেয়েছিলাম।

মনাস্ট্রি দেখতে। এই বৌদ্ধমঠটি স্থানীয়দের মুখে মুখে গোল্ডেন টেম্পল নামে খ্যাত। মঠটির বহিরঙ্গে অন্যান্য বৌদ্ধ মঠের মতোই বৌদ্ধ ধর্মের আটটি পবিত্র চিহ্ন চোখে পড়ল। চূড়ায় কলস, পদ্ম ইত্যাদির মোটিফ। চার কোণে ধ্বজ, সামনে ধর্মচক্র যার দু পাশে হরিণ যা সারনাথে বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মসভা বা ধর্মচক্র প্রবর্তনের দ্যোতক। মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ অপার্থিব মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বিশ্বাস তথাগত, অমিতাভ এবং পদ্মসম্ভবের চল্লিশ ফুট উঁচু তিনটি অপরূপ স্বর্ণময় প্রতিমা প্রত্যেককে প্রথম দর্শনে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয় যে কিছুক্ষণ অন্য কোন কথা মনেই থাকে না, অন্য কোন দিকে তাকাতেও দেবে না মূর্তি তিনটি। ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেলাম কাছ থেকে ভালো করে দেখতে। ত্রিমূর্তির মাঝখানে গৌতম বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়, বাঁহাতে ভিক্ষাপাত্র।

তাঁর ডান দিকে অমিতাভ এখানে অমিতায়ুস রূপে। পরনে রাজবেশ, মাথায় নবপত্রিকার স্বর্ণকিরীট, হাতে অমৃত কলস।

গৌতম বুদ্ধের বাঁদিকে পদ্মসম্ভব বিরাজিত। আমার চোখের সমতলে বলে সবার আগে চোখে পড়ল তাঁর গাম বুটের মতো জুতোটি - বরফের উপর দিয়ে হাঁটার তিব্বতি জুতো। এমন জুতো পরা মূর্তি একমাত্র পদ্মসম্ভব ছাড়া আর কারও হয় না বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বে। ধর্মপ্রচার করতে তুষারময় তিব্বতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন, সামান্য অশ্ব-খুরের মতো স্থানও বাদ না দিয়ে। সে কথা মনে রেখেই পদ্মসম্ভবের এই জুতোপরা মূর্তি সর্বত্র পূজিত হয়। এরপরে চোখ যায় মূর্তির বাঁদিকের বুকের কাছে রাখা বস্তুটির দিকে। একটি বিশেষ ধরনের খট্টাঙ্গ – শৈব কাপালিকদের হাতে যা থাকে তারই রূপান্তরিত তিব্বতি রূপ। একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি – একটি ছোট আকারের ত্রিশূল, তার নীচে তিনটি নরমুণ্ড এবং তাতে পাঁচ রঙের সিল্কের ফিতে বাঁধা থাকে। মূর্তির ডান হাতে বজ্র, বাঁ হাতে করোটির অক্ষয় পাত্র। পদ্মসম্ভবের চোখ বিস্ফারিত এবং নাকের নীচে সরু গোঁফ। এই গোঁফ, জুতো আর খট্টাঙ্গ কোন মূর্তিতে একত্রে দেখলে তা পদ্মসম্ভবের মূর্তি বলে চিহ্নিত করা সহজ। মাথার মুকুটটিও বিশেষ, বজ্রের মোটিফ দেওয়া।

দেয়ালে দেয়ালে এবং ছাতেও ছবি ও নানা অলংকরণ দেখলাম। সেখানে ভীষণদর্শন ধর্মপালরা যেমন আছেন, আছেন অন্যান্য বজ্রযানী দেবতারাও। শঙ্খ, ছত্র, মৎস্য ইত্যাদি শুভ চিহ্ন চোখে পড়ল স্থানে স্থানে। স্পোর্টস গ্লাসের কল্যাণে যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে দেখলাম, মূর্তি থেকে অলংকরণ সবই। শেষে গ্লাসটি ঝোলায় রেখে ত্রিমূর্তির মধ্যমণি শাক্যমুনির সামনে

ভৌগোলিক দূরত্বও। কিন্তু তাঁরা কেমন একত্রে বিরাজ করছেন। ইতিহাস-ভূগোল-ধর্ম-শিল্প সবকিছুর মেল্টিং পট হল সংস্কৃতি। বজ্রযানী সংস্কৃতির বুদবুদে কাটানো সময়টি মনের পটে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে করতে বেরিয়ে এলাম বর্তমান সময়ে। সব সঞ্চয় স্পর্শাতীত ছিল না। তিব্বতি গয়না কিনলাম, তিব্বতি ভোজনেও তৃপ্ত হল উদর।

এত কিছু বলার পরেও কিছু আছে যা না জানলে নামদ্রোলিং বৌদ্ধ মঠটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা পূর্ণতা পাবে না। এবং বিশেষ একজনের কথা না জানালে আমার ভ্রমণ কাহিনিও সম্পূর্ণ হবে না। তিনি পেনর রিনপোচে। এই মঠের গুরুত্ব বুঝতে চাইলে তাঁর সঙ্গে জড়িত একটি বিশেষ সময়কে একটু ফিরে দেখতে অনুরোধ করব পাঠককে। আসুন না টাইম মেশিনে চড়ে ছয় দশক পিছিয়ে যাই আমরা। মেরুন ও কাষায় বর্ণের বস্ত্র পরিহিত এক তিব্বতি লামা হস্তীযূথ ও চন্দনের বনের জন্য বিখ্যাত কর্ণাটকের এই অঞ্চলে পা রাখলেন। তাঁর সঙ্গী আরও কয়েকজন লামা পিছনে একটু দূরে থেমে গেলেন। একসঙ্গে দলটি এলেও বোঝা যায় প্রথম ব্যক্তিই দলের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়। তিনি পেনর রিনপোচে। পেনর বয়সে যুবা, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি দশকের হিসেবে মাপা যাবে না। বাকি ক'জন তাঁর সশ্রদ্ধ অনুসারী মাত্র। পেনর তাঁর দৃষ্টি বিছিয়ে দিলেন চারিদিকে, যতদূর চোখ যায়। তাঁর দৃষ্টির ভাষা কোন একটি শব্দে ধরা যাবে না। কারণ তাতে শোক আছে, অন্বেষণ আছে, জিজ্ঞাসা আছে এবং আছে বিশ্বাস। কিছুমাত্র দিন আগে তিনি অসম্ভব সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিব্বতে তাঁর সাধনার পীঠস্থান হাজার বছরের ঐতিহ্যময় পালয়ুল মঠ ছেড়ে ভারতে এসেছেন। ভারতে প্রবেশ করতে তাঁদের প্রায় তিনশো জন লামার দলটি তিব্বত থেকে অরুণাচল প্রদেশ অভিমুখী পথ নেয়। একে কষ্টবিছানো দুর্গম চড়াই-উৎরাই, তায় পিছনে সততই খ্যাপা কুকুরের মতো চিনা সেনাদের তাড়া ও গুলি বৃষ্টি! এই অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে আসতে দলটি হারিয়েছে অধিকাংশ সদস্যকেই। এখন সাকুল্যে তিরিশ জন বেঁচে আছেন। কিন্তু পেনর রিনপোচের দায় যে তাঁর নিজের বা সঙ্গীদের জীবনের চেয়েও বেশি। গুরুশিষ্য পরম্পরায় লব্ধ প্রায় সহস্রাধিক বছরের জ্ঞানের ধারাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার স্থান চাই। কোনও বৌদ্ধ মঠ তো যে কোনও স্থানে গড়ে তোলা যায় না! সেই স্থানের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকারের দেওয়া এই স্থানে সেইসব বৈশিষ্ট্য না-ও পাওয়া যেতে পারে। তখন পেনর রিনপোচে কী করবেন! ধরমশালা এলাকায় দলাই লামার নেতৃত্বে 'গেলুগ পা' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। কিন্তু তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম উত্তরাধিকার যে পেনর রিনপোচের 'নিংমা' সম্প্রদায়েরই। তিব্বতে বজ্রযানের ভিত্তি যাঁর হাতে, কথিত সেই গুরু পদ্মসম্ভবই 'নিংমা' পরম্পরার আদি পুরুষ। সেই ধারা কি রাজনৈতিক অস্থিরতার বলি হয়ে কালস্রোতে ভেসে যাবে! স্থান পছন্দ না হলে ভারত সরকারকে বলাও যাবে না যে এই জায়গা উপযুক্ত নয়, অন্য জায়গা দিন ধরমশালার মতো। এই দুর্দিনে আমরা-ওরা করাও উচিত নয়, তাছাড়া সর্বোপরি কথায় আছে - ভিখারির নেই চয়নে অধিকার। তাহলে উপায়! অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রবাহিত অভঙ্গ 'নিংমা পা' ধারার দীপশিখা দারুণ ঝড়ে নিভে যেতে দেওয়া যায় কি! প্রয়োজনে হাত পুড়িয়েও সে শিখা বাঁচাতেই হবে – এটাই সংকল্প। আর সে কাজ করার যোগ্য লোক পেনর রিনপোচে। তাঁর মতো যুবা বয়সে অগাধ জ্ঞান নিংমা সম্প্রদায়ের আর কারই বা আছে? বজ্রযান দর্শনে পাণ্ডিত্য যদি বা থাকে, তাঁর মতো কঠিন প্রত্যয় আর দুর্জয় সাহস কার? এই অসম্ভব পরিস্থিতিতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব। দুঃসময়ই যে পরীক্ষার সময়।

পেনর রিনপোচে নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে আত্মস্থ হলেন। একে একে স্মরণ করলেন গুরু পদ্মসম্ভবের বজ্রের ন্যায় প্রত্যয়ী 'পদ্মাকর' রূপ, শাক্যমুনি বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় সম্বুদ্ধ রূপ, অমিতাভ বুদ্ধের আয়ুপ্রদ অমিতায়ুস রূপ। তারপর চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন মেঘ ছিঁড়ে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়েছে সামনের বিস্তৃতিতে। তাতে যেন রামধনুরঙা বীজমন্ত্র চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। পেনর রিনপোচের দুচোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। করুণাময় অবলোকিতেশ্বরকে তিনি লক্ষ কোটি প্রণাম জানিয়ে সেই মুহূর্ত থেকে কাজে লেগে গেলেন।

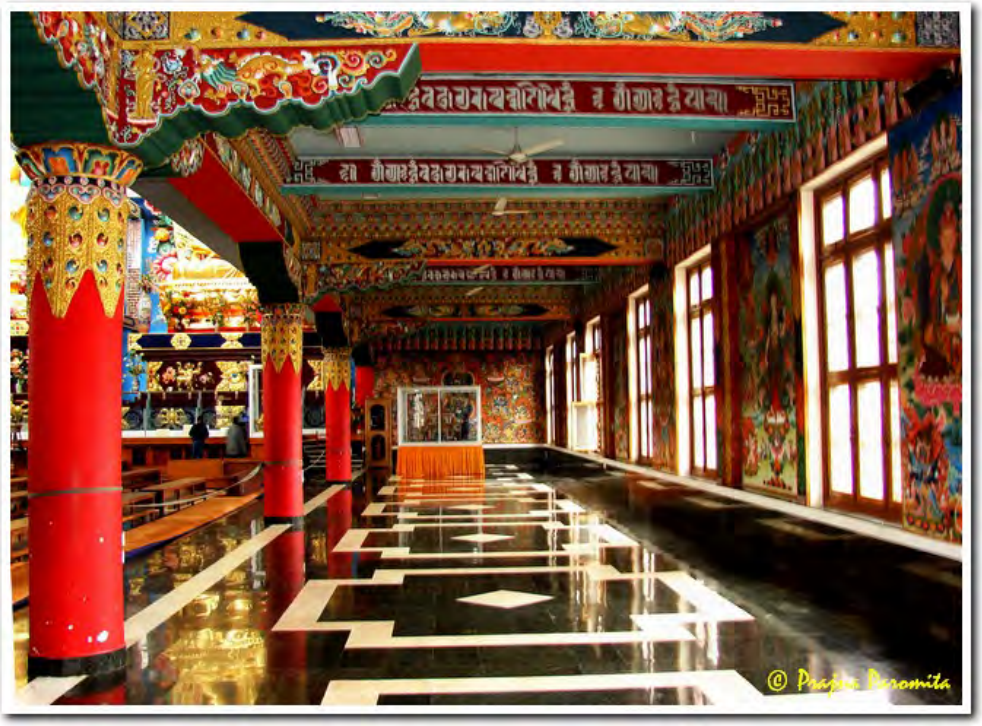

নবীন লামারা নিয়ে থাকেন, বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ নিয়ে পড়াশোনা করেন যারা তেমন অনেকেও আসেন। পাঁচ হাজারের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর বসবাসের ব্যবস্থা আছে এখানে। মাত্র তিনশো টাকা হাতে নিয়ে পেনর রিনপোচে তাঁর সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে নিজে হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন, মাটি কেটেছেন, কাঠ বয়েছেন। সারা জীবন ধরে ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পাশাপাশি নির্দ্বিধায় প্রার্থী হয়েছেন বিভিন্ন সংস্থা, সম্পন্ন বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে। ২০০৯ সালে তাঁর স্বপ্নসম্ভবের মহীরুহ রূপ দেখে তিনি গত হন। ধর্ম সরিয়ে রেখে যদি সাদা চোখেও দেখি, পেনর রিনপোচে যে একজন অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। কর্ণাটক পর্যটন মানচিত্রের এই উজ্জ্বল বিন্দুটিকে চাক্ষুষ করতে নামড্রোলিং মঠের বৃহৎ কর্মকাণ্ড দেখা বা মঠের অপূর্ব স্থাপত্য ভাস্কর্যে মুগ্ধ হওয়ার পরেও কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, যদি না পেনর রিনপোচের কথা জানি। আমার তাঁকে 'আত্মদীপ ভব' – গৌতম বুদ্ধের এই উপদেশের মূর্ত প্রতীক মনে হয়েছে।

প্রজ্ঞা পারমিতা ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস লিখছেন বছরদশেক। মেডিক্যাল জার্নালিজম করেছেন 'বর্তমান' প্রকাশনার স্বাস্থ্য পত্রিকাতে। 'মাতৃশক্তি' ও 'জাগ্রত বিবেক' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যরক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে কলম ব্যবহার করে থাকেন।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

নাগজিরার জঙ্গলে

দেব মুখার্জি

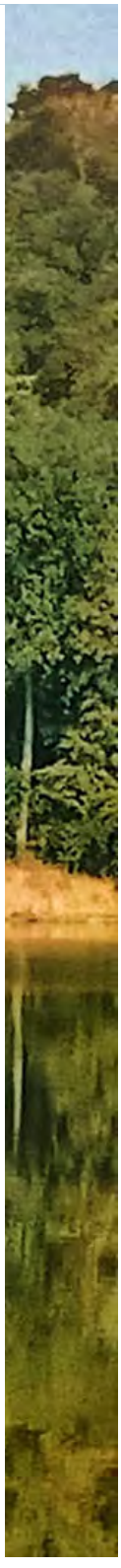

লগ হাটের বারান্দায় বসে ছিলাম, যে দিকে চোখ যায় সবুজে সবুজ, তবে এই শীতের জঙ্গলে নানান সবুজের মাঝে কিছুটা হলুদ আর ধূসর ভাব এসেছে, সামনে লেকটার জলে হলদেটে সবুজ ছাওয়া পড়েছে পাহাড়টার আর সেখানের নানান গাছগুলোর। পাড়ের দিকে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে লম্বা ঘাসগুলো শুকিয়ে সবুজ থেকে ক্রমশ বাদামি হচ্ছে, একটা হালকা হাওয়া বইছে ওই জলের ধার থেকেই, তবে হিমেল নয়।
পরপর অনেকগুলো ছাতিম গাছ এদেশে বলে সপ্তপর্ণী। জারুল গাছটার পাশ দিয়ে ডানদিকে ঘুরে একটা বাঁশের সাঁকো, সেখানে একটা মস্ত গাছ, প্রকাশ বললে, এটাকে মারাঠিতে বলে লেন্ড্রা, হলুদ ফল হয় পাখিতে খায়। সেগুন, করৌঞ্জ, হরিতকি, সাজা, কুসুম, কিছু গাছ চিনতে পারি আর বেশিরভাগ অচেনা, আর এর আগে চিনলেও ফের ভুলে গেছি, প্রকাশ আবার বলে 'দেখো এটা সালাই, মারাঠি নাম'...শশীনভাই বলেন 'গুগগুল'... 'আর ওইটা অর্জুন', রাজুদা যোগ দেয়।
একদল হনুমান কিছুটা লাফালাফি করে চলে গেল, ছোট ছোট ঘাসের সবুজ ঘাসজমি, একটু দূরে একপাল হরিণ, তিনটে ময়ূর ওখানেই ... ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও – একটু কর্কশ ডাক এদের, থেকে থেকে কানে আসছে, সামনে একটা আমগাছ, মগডালটা শুকিয়েছে কী কারণে কে জানে, টিয়াপাখিগুলো, সেই ডালে বসেই ডেকে চলেছে, আরও নানান পাখি, উড়ছে একডাল থেকে অন্যডালে, নীল আকাশের বুকে নানান সুরে ডাকছে। একদল ছাতারে কোথা থেকে উড়ে এসে রাস্তার ওপরেই বসে চ্যা চ্যা করে, ঝগড়া করছে বোধহয়। হিন্দি বা মারাঠিতে এদের বলে 'সাতভাই', আগেই জেনেছি । তিনটে সম্বর, হড়বড় করে একটু দৌড়ে গাছের পেছনে গিয়ে থেমেছে তারা। হরিণ প্রজাতির মধ্যে সব চেয়ে বড়সড় চেহারা এদের, আবার আমার মনে পড়ল বড়ই মন্দবুদ্ধির হয় এরা, পেঞ্চের খুরসাপারের গাইড বলেছিল সে কথা, সেইবার হ্যান্ডসাম-এর (বাঘ) ডেরায় পৌঁছে। দুটো ফিমেল খয়েরি বাদামি রঙের, আর কালচে রঙেরটা মেল, বাহারি সিং, মাথার ওপরে বেশ ডালপালা ছড়িয়ে। ঘাড়ের কাছে লোমগুলো, থুতনিতেও, কী দৃপ্ত ভঙ্গি, কী অপরূপ রূপ এই পূর্ণবয়স্ক সম্বরের। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে, কানগুলো খাড়া করেছে, অদ্ভুত। একেবারে ছবির মত নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে অনেকক্ষণ... একেই বোধহয় বলে চিত্রার্পিত। সে দৃশ্য দেখে অভিভূত শশীনভাই ফিসফিস করেন, 'আনওয়ার্ল্ডলি', মনে মনে বলি 'অপার্থিব!'

হাঁটছিলাম। একবার লেকের ধারে সাঁকোটার কাছে যাই, জলে মাছেরা ঘাই দিচ্ছে, তাকিয়ে ছিলাম ওই দিকে, পরপর তিনটে বুড়বুড়ি উঠল... ডাঙায় বসে জলের তলায় চারে কী মাছ জমেছে ওই বুড়বুড়ি দেখে বলত বাবা কিংবা বড়শিতে ঠোকর মারা দেখে এক্কেবারে নির্ভুল, শেখার চেষ্টা করতাম, আজ ওই তিনটে বুড়বুড়ি দেখে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল... তেলাপিয়া। আর তারপর চশমাটা ঝাপসা হল, আকাশের দিকে তাকাই আর তারপর পায়ের নিচে নজর পড়ে শুকনো পাতাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ... আবার সেই পুরোনো কথাটা মনে পড়ে "শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলার সময় মনে রেখো যৌবনকালে কতোটা ছায়া দিয়ে তারা তোমায় আগলে রেখেছিল।" কী যে গভীর দর্শন এর মধ্যে রয়েছে লুকিয়ে, মনটা উদাস হয়।
'দাদা ইধার দেখো...', প্রকাশ ক্যামেরা তাক করেছে... বড় ভালো ছবি তোলে প্রকাশ...। নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে, সেভাবে দেখা সাক্ষাৎ আর হয়না তবে অনেকদিন পরে আবার চারজন একসঙ্গে হতে পেরেছি, আর তারপর এই জঙ্গলের কোর এরিয়ায় এখন লগহাটে। মোবাইলে ধরে রাখা ছবিটা দেখায় ও, প্রকাশের হাতটা জড়িয়ে ধরি, কৃতজ্ঞতা জানাই, চারটে লাইন মনে আসে...

हाथ छूटे भी तो
रिश्ते नहीं छोड़ा करते
वक़्त की शाख से
लम्हे नहीं तोड़ा करते

(হাত দুটো চলে যেতেই পারে দূরে
ভালবাসা তবু থাকবে হৃদয় জুড়ে।
সময়ের শ্যামল সবুজ শাখা থেকে মধুর সে পল - পারবেনা নিতে ছিঁড়ে।)

ফেললেন আমাদের', তারপর স্বগতোক্তি করেন 'অ্যামেজিং'... রাজুদা আঙুলটা তুলে ঘড়ির দিকে দেখায় বলে...'ঢাই বাজ চুকা, চলতে হ্যয় কেয়া?' সাফারির সময় হয়েছে, গাইড ধনলাল মাডভি অপেক্ষা করছিল... আমরা ডাকতেই বললে... 'চলিয়ে।' প্রকাশ বিড়বিড় করছিল -

पौरे को भटकने दो
खोजने दो नए रारते
(প্যয়রো কো ভটকনে দো
খোজনে দো নয়ে রাস্তে)

আলো ছায়া মেখে জঙ্গলের পথে গাড়ির চারটে চাকা গড়ায়, পথের লালচে মাটির মিহি ধুলো উড়তে থাকে, গুলজার সাহেবের চারটে লাইন ফের মনে পড়ে, অনুবাদ করে দেয় মৌসুমী।

धूप अठा ले
लम्बा सफर है
काम देगी
छाँव भी रख ले
थकने लगेगा तो
आराम देगी
(রোদ্দুরটা সরিয়ে নিও
লম্বা পথে কাজেই দেবে
ছায়াটাও রেখে দিও
ক্লান্ত হলে আরাম দেবে)

নির্জন নিরিবিলি জঙ্গল, সরকারি বনবাংলো... মধুকুঞ্জ, নামটা বড় মনে ধরেছিল আমার। দরজার সামনে একটা সিমেন্টের বেঞ্চ, একেবারে জলের ধারে, চারপাশে নানান গাছগাছালি, ওয়াচ টাওয়ার। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চারদিক দেখি, ধনলাল বলেছিল, বেলা পড়লে পশুরা আসে জল খেতে, তবে এখনও কেউ আসেনি, নেমে পড়ি সেই মাচান থেকে। এসে বসি সেই বেঞ্চে, শীতের শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদ মেখে। জলে মাছের ঘাই, মাকড়সার সাঁতার কাটা, জমে থাকা শ্যাওলা, এদেশে বলে কাই, তাকিয়ে ছিলাম ওইদিকেই, মনে পড়ল ওকিল ভাইকে, অজানা অচেনা বয়স্ক মানুষটা সেদিন শিখিয়েছিল এই কাই বড়শিতে জড়িয়ে মাছ ধরার কৌশল। পুরোনো কতো কথা সব , মনের মাঝে ভেসে ওঠে।
নিদা ফাজলি সাহেবের চারটে লাইন আমার বড় প্রিয় বলে উঠি...

वक़्त के साथ है मिट्टी का सफ़र
सदियों से
किसको मालूम, कहाँ के हैं,
किधर के हम हैं
(চিরকাল হতে সময়ের সাথে
চলিতেছে মাটি, চলিতেছে জমি।
কেহ নাহি জানে কোথাকার ধূলি
কেন আমি অজানা সে পথ চলি
কে জানে কোথায় - চলিতেছি শুধু আমি)
(ভাবানুবাদ- কল্যাণশঙ্করদা)

বুদ্ধদেব গুহর 'মাধুকরী'র একটা লাইন মনে পড়ে -
"কোথা থেকে কোথায় আসে মানুষ রোজগারের সন্ধানে।" সত্যিই তো কোথা থেকে কোথায় আসে মানুষ... কিসকো মালুম, কঁহা কে হ্যয়, কিধর কে হম হ্যয়।

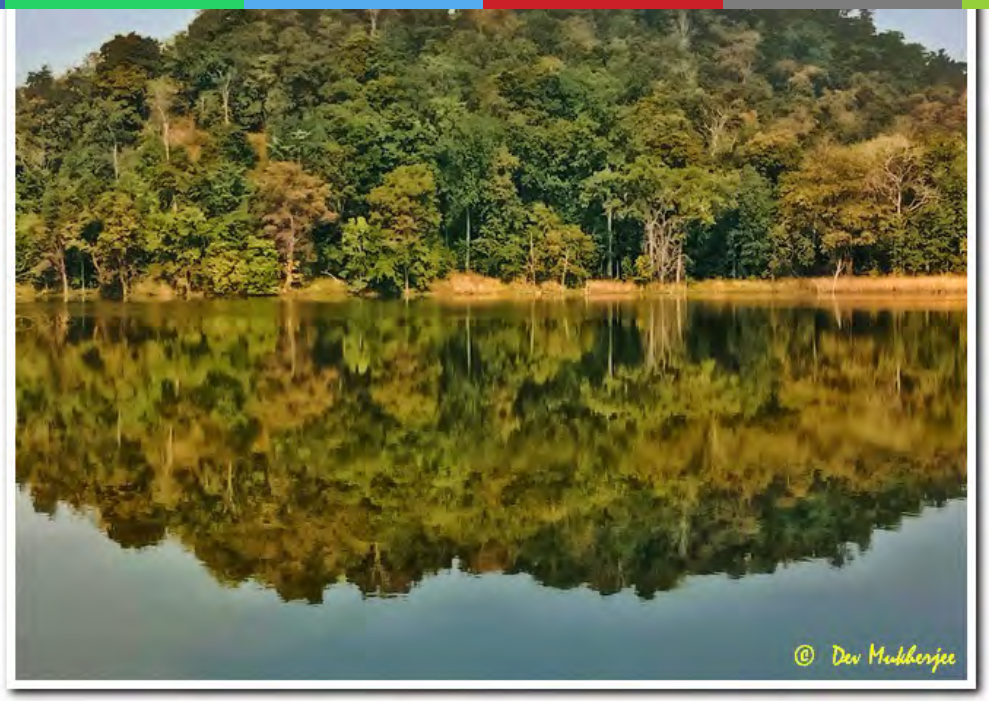

মাছরাঙাটা জলের ধারেই শুকনো গাছটার ডালে, শিকারের খোঁজে, মাঝে মাঝে জলে নামছে ছোঁ মেরেই আবার ডালে বসে গায়ের জল ঝাড়ছে ডানা নাড়িয়ে। দূরে একটা পানকৌড়ি, একবার ডুব দিয়ে আবার মাথা তুলে গলাটা উঁচু করেছে। সামনের গাছটায় একদল হরিয়াল...ইয়েলো ফিটেড গ্রিন পিজিয়ন, মহারাষ্ট্রের স্টেট বার্ড, জঙ্গলে ঘুরেই শেখা। লেকের অপরপারে বনদফতরের একটা বাংলো...'নিলয়', সাধারণের জন্যে নয়, ধনলাল বলেছিল, 'বড়ে সাহাব লোগ আকে ঠহরতে হ্যয়।' আমি ভাবি এজন্মে তো হলনা ... দেখা যাক পরের জন্মে যদি প্রভাবশালী হতে পারি।
একটা কাঠঠোকরা নিম গাছটার মোটা গুঁড়িতে ঠক ঠক করে ঠুকছে, চিন্তাটা কেটে গেল, লাল মাথাটা নাড়িয়ে আমায় একবার দেখল আর তারপর গুঁড়ির অন্যপারে মুখ লুকোল। কতগুলো জল ফড়িং... কমলা রঙের, জলের ধারে নুইয়ে থাকা ঘাসের মাথায় বসছে আর উড়ছে আবার এসে বসছে, একটা বোঁওওও করে শব্দ কানে আসে, স্বচ্ছ পাখনাগুলো দ্রুত নাড়াচ্ছে... 'আমাকে খুঁজে দে জল ফড়িং'... শিলাজিৎ-এর গানটা ... হেসে ফেলি বলি... এইতো জল ফড়িং।

মস্ত বড় সাজা গাছটা হেলে রয়েছে, তবে জয়ী জীবনযুদ্ধে, একবার গিয়ে হাত দিই ফাটাফাটা গায়ে... ক্রোকোডাইল ট্রি, কুমিরের গায়ের সঙ্গে নাকি সাদৃশ্য, তবে আমার কাছে এ শিব বৃক্ষ, জঙ্গলের মানুষদের সঙ্গে শিব বৃক্ষের পুজোয় আমিও যোগ দিয়েছিলাম। এলোমেলো হাওয়ায় শুকনো পাতাগুলো উড়ছিল...সরসর করে একটা শব্দ, একটা বনজ গন্ধ...মাটির

"মনে মনে বহুদূর চলে গেছি –
যেখান থেকে ফিরতে হলে আরো একবার জন্মাতে হয়..."
তাল কাটে প্রকাশের গলার আওয়াজে... 'ঘরে চলো দাদা... সন্ধে হচ্ছে কী দরকার এই ফাঁকা জায়গায় একা একা বসে থাকার... কাল নাকি এদিকে ভাল্লুক বেরিয়েছিল... ধনলাল বললে' ... 'বলি ভয় দেখাসনা তুই।'
প্রকাশ এসে হাতটা ধরে, বলে - 'ওঠো', বড়ো ভালো লাগে সেই স্পর্শ, আন্তরিকতা। অনেকগুলো ছবিও তুলে দেয় সে।
একটা বোর্ড লাগিয়ে রেখেছে বন দফতর, রঙগুলো আজ বিবর্ণ, মারাঠি ভাষায় কিছু লেখা পড়ার চেষ্টা করি, শিবাজি মহারাজের আজ্ঞাপত্র... বলি বুঝিয়ে দিতে কী লেখা রয়েছে...
"Aagyaptra of Shri Shivaji Maharaj" which clearly states that unreasonable or illegal tree felling should not be done.
If required for NAVY ship building some selective trees can be taken after giving proper compensation.
Trees gone dry can be taken after careful permission of the owner… NOTHING SHOULD BE TAKEN FORCIBLY AT ALL.
বাংলাতে কেউ কথা বলছে, পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি লতাকুঞ্জের সামনে বেশ কয়েকজন... কাঁধে গলায় মস্ত বড়ো সব ক্যামেরা, লেন্স... সুব্রতদা Ex in Subrata, দেবরাজদা, ফেসবুকেই প্রথম পরিচয় ... বড় ভালো ছবি তোলেন ওঁরা, ওয়াইল্ড লাইফের। অল্প আলাপচারিতা, হাত নাড়ি, আবার দেখা হবে।
পথের ধারে সেই আমগাছটা, শুকিয়ে যাওয়া মগডালে টিয়াপাখিগুলো এখনও কি বসে, তাকিয়ে দেখি ওপরে... হ্যাঁ রয়েছে সবাই দলবেঁধে একটা ডালে। ভাবি আনতে হবে এখানে বাকি সব বন্ধুদের... বাবা বলত ভালো জিনিস সব সময় ভাগ করে নিতে হয়, তবেই আনন্দ বাড়ে।
"আম্বুয়া কি ছাঁইয়া মেঁ
ঝুলা ঝুলাবে রে, হাঁ
মঙ্গল গাওয়ে..."
ঠুমরি... ভাস্বতী গেয়েছিল সেবার পেঞ্চের জঙ্গলে এসে, ছবিগুলো দেখে... মন কেমন করা সেই সুরটা আজ আবার মনে পড়ল।
রাত প্রায় নটা বাজে, ডিনারের সময় নির্দিষ্ট এখানে। আমাদের আজকের আস্তানা থেকে ক্যান্টিন সামান্যই দূরে, পায়ে হাঁটা রাস্তা, ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের হই, রাতের জঙ্গল, নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে। পোকার ডাক, একটা শব্দ 'কিরি কিরি কিরি'... একটানা একনাগাড়ে হয়েই চলেছে, মোবাইলে টর্চ জ্বেলে এগোই।
ক্যান্টিনের বারান্দায় দুজন দাঁড়িয়ে, ক্যামেরা খুলে একে অপরকে ছবি দেখাচ্ছেন, ভেতরে একদল মানুষ, গল্প করছেন জঙ্গল নিয়েই, কানে আসে... কালকে সাফারি রয়েছে, ভোরে উঠতে হবে... আজকের বিকেলটায় সাইটিং হয়নি। এক ভদ্রলোক আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোঈ লাক', বুঝলাম জিজ্ঞেস করছেন কিছু দেখেছি কিনা সাফারির সময়। উত্তর দেওয়ার আগেই একটা হৈ চৈ... 'লেপার্ড, তেন্দুয়া'... বারান্দায় সবাই বেরিয়েছে ছুটে... কে কোথা থেকে টর্চের আলো ফেলেছে কে জানে, বোধহয় ফরেস্ট গার্ডেরা, আমি আলোর দিকে তাকাই, তারপর চশমাটা খুঁজি... ধীর গতিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে লেপার্ডটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। উৎসাহী জনগণের মাঝে প্রকাশের গলাটা কানে এল... 'জনম সফল হো গ্যয়া।'
সকালে পরিচয় হয়েছিল পঙ্কজ বনসোডের সঙ্গে, ও এই ক্যান্টিনের ঠেকাদার... জঙ্গলের বাইরে সাকোলি, ছোট জনপদ সেখানেই বাড়ি, আশেপাশের গ্রামের দু-তিনজন কর্মচারী নিয়ে তার এই ছোট্ট ব্যাবসা। সরকারি নিয়মে জঙ্গলের ভেতরে খাবার সব নিরামিষ, তবে ডিম পাওয়া যায়। সাধারণ আয়োজন, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যথেষ্ট আন্তরিক। মুকেশ খাবার বানিয়ে পরিবেশনও করছিল... বলেছিলাম নিজেদের পছন্দের কথা ... ওই তেল-মশলা কম দেওয়ার কথা ... জিজ্ঞেস করলে আমায় 'जेवण कसे आहे' (খাবার ঠিক হয়েছে তো) বাঙালি উচ্চারণে মারাঠি বলি আমি... ছান কেলা তুমহি (খুব ভালো করেছো তুমি)।

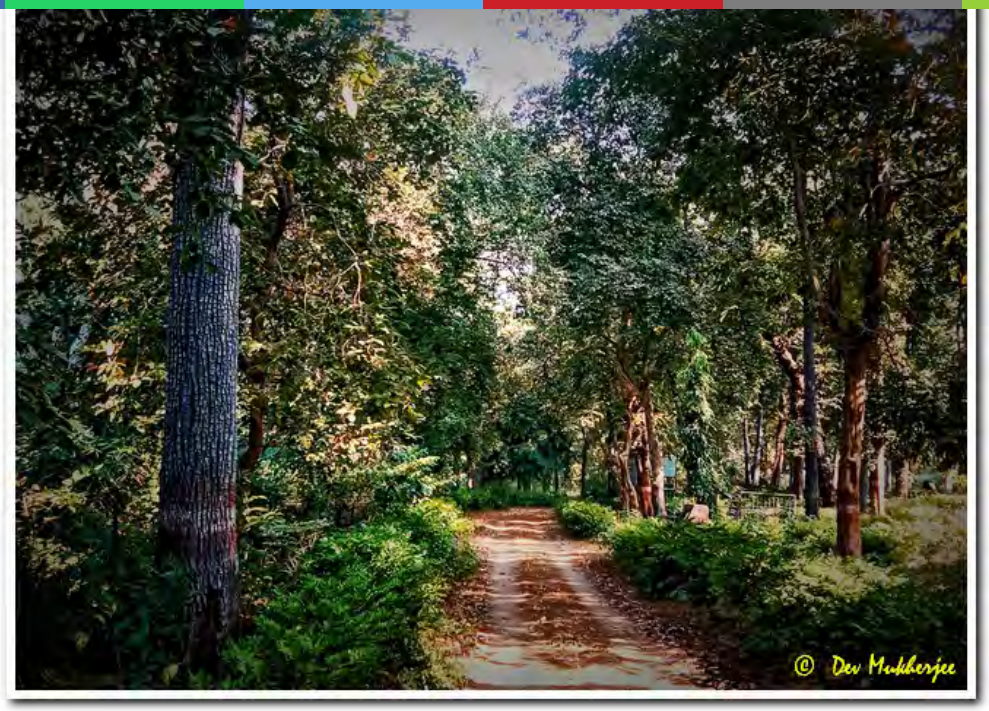

অনেকটা রাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছি... জঙ্গলের নৈঃশব্দ উপভোগ করছিলাম, ভোরের আলো ফোটার আগেই পাখিদের কলরব...রাজুদা বললে গুড মর্নিং করছে সমস্বরে। দরজা খুলে বাইরে আসি, টপ টপ করে জলের শব্দ গাছের পাতায়, জমির ঘাসগুলো ভিজে ভিজে আগায় শিশির বিন্দু... শশীনভাই বললেন 'ওস'...গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াই, শব্দটা বারবার কানে বাজছে ... রাজুদা বলল, 'দাদা শুনহ ক্যয়সে গুঞ্জ রহা হ্যয়... ওস কী বুন্দে।' বলি, 'সহি বোলে আপ।' শশীনভাই বলে ওঠেন লীলা সিনেমার জগজিৎ সিং... শুনেছো গানটা? উনি গুনগনিয়ে ওঠেন...

जाग के काटी सारी रैना
नैनों में कल ओस गिरी थी
जाग के काटी सारी रैना
(জাগ কে কাটী সারী র‍্যয়না
নয়নো মে কাল ওস গিরী থী
জাগ কে কাটী সারী র‍্যয়না)
(গুলজার সাহেব)

আকাশটা হাল্কা ফরসা হয়েছে ধনলাল এসে দাঁড়ায়, আজকের সারথি বোরকর... দুজনেই তৈরি। সামনের রাস্তার ধারে গাছগাছালির মাঝে একটা লালচে রঙের বিল্ডিং... জিজ্ঞেস করি ধনলালকে 'কেয়া হ্যয় ও'... 'মন্দির হ্যয় সাহাব'... বুঝি জঙ্গলের বিপদসঙ্কুল জীবনে উনি হয়ত রক্ষাকর্তা... মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস। প্রকাশ বলল, 'মাথথা টেক লেতে।' আগে আগে ও হাঁটছিল... পেছনে আমরা তিনজন। লোহার গরাদের পেছনে পাথরের মূর্তি, সামনে লেখা হনুমান মন্দির, ফুল মালা প্রসাদ পূজারী কেউই নেই, ভক্তের ভগবান এখানে নিঃসঙ্গ, একাকী। চারটে লাইন মনে পড়ে, বলে উঠি...

सारी दुनिया का जो
मसीहा है...
आपने घर में वो
अकेला है...
(সারী দুনিয়া কা জো
মসীহা হ্যয়...
আপনে ঘর মে ওহ
আকেলা হ্যয়)
(রাজেশ জোহরী)

একটা বোর্ড লেখা রয়েছে...কোসোমতন্ডী, মুরপার, মঙ্গেঝরী, সাকোলি... সঙ্গে তীরচিহ্ন দিয়ে দিক নির্দেশ... ধনলাল, সারথি বোরকরকে নির্দেশ করল... प्रथम, साकोलीकडे जाणारा रस्ता घ्या काल रात्री दिसलेला बिबट्या आज दिसू शकतो.(প্রথমে সাকোলির দিকের রাস্তাটা নাও, কাল রাতে দেখা পাওয়া তেন্দুয়াটা আজ দেখা যেতে পারে।) ধনলালের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি দেখি বেশ কিছুটা দূরেই একটা লেপার্ড, চলার পথ জুড়ে মৃদুমন্দ গতিতে, আমরা গাড়ি সাইড করে ইঞ্জিন বন্ধ করি, কিন্তু পিছনে আসা অগুন্তি জিপসি আমাদের টপকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর তারপর সামনে থেকে আসা জিপসি, ক্যান্টার। বড় বড় লেন্স লাগানো ক্যামেরা হাতে ফটো শিকারিরা আর বেশ কিছু ট্যুরিস্ট জঙ্গলে জানোয়ার দেখে, উত্তেজিত, জিপসিতে বসে দাঁড়িয়ে, জিপসিগুলো এলোমেলোভাবে রাস্তা জুড়ে। চিতাবাঘটা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকের ঘন বাঁশ বনের জঙ্গলটায় ঢুকে পড়ল, রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা জিপসিতে উৎসাহী জনগণের উঁকিঝুঁকি বাড়ল... আরোও কয়েকটা জিপসি এসে দাঁড়িয়ে পড়ার পর, চলার পথটা এবার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল... আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটাই

অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে আছি ভাবছি কখন যে রাস্তাটা পরিষ্কার হবে... ঠিক তখনি মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো অধৈর্য হবেনা... তুমি তো জানো তোমার জীবনসফর তোমার জীবনপথ... আমি ঘাড় নাড়ি। কয়েকটা লাইন মনের মাঝে তখন -

चुम लेता हूँ
हर मुश्किलो को
मैं अपना मानकर
जिन्देगी कैसी भी है
आखिर है तो मेरी ही
(চুম লেতা হুঁ
হর মুস্কিলো কো
ম্যয় অপনা মানকর
জিন্দেগী কৈসী ভী হো
হ্যয়তো মেরী হী)
(হোয়াটস অ্যাপে পাওয়া)

ভোরের জঙ্গলের ভেতরে মনোরম পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব যে খারাপ লাগছিল তা নয়, তবে সময় নষ্ট হচ্ছে এর জন্যে খারাপ লাগছিল। সূর্যের আলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে এসে পড়েছে রাস্তার ওপরে, লেপার্ডটা বনের আরও ভেতরে সরতেই রাস্তার অবরোধ উঠেছে, বেশ কিছু ময়ূর হরিণ, নীলগাই, সম্বর, হনুমান আর নানান পাখপাখালি, গাছপালার মাঝে ঘুরে বেড়াই জিপসিতে বসে... শীতের জঙ্গলের রূপ রস গন্ধে মোহিত হই, নৈশব্দতা ভেঙে কখনও পশুপাখিদের ডাকাডাকি। রাস্তার ধারেই একটা শুকনো গাছ, ঝরা পাতার ওপরেই গাড়ির চাকাটা গড়ায়, বোরকরকে বলি জরা রোকো... বন্ধ করো ইঞ্জিন। শীতের হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরে পড়ছে,জঙ্গলের অসীম নৈঃশব্দ তার মাঝে সেই ঝরা পাতার শব্দ কানে আসছে... ফিসফিস করে বলে উঠি -

मैं पेड़ हूं हर रोज़ गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे...
(ম্যয় পেড় হুঁ হর রোজ গিরতে হ্যয় পততে মেরে, ফিরভি হাওয়াওসে বদলতে নেহী রিস্তে মেরে।)
(হোয়াটস অ্যাপে পাওয়া)

সঙ্গীরা বলে ওঠে "কেয়াবাত দাদা।"

লগহাটের রাস্তায় জিপসিটা ঘোরায় মাডভী... ভাল্লুকের ডাকাডাকি কাল বিকেলে শুনেছিল সে, ওই কুয়োটার ধারে। কাল উঁকি মেরে দেখেছি বেশ বড় সেই কুয়োটা কালো টলটলে জল... বারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিল তুলসীরাম, জেনেছি আর তিনমাস বাকি আছে চাকরির, তারপর রিটায়ার করবে, বাড়ি জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে, জঙ্গলকে ভালোবেসে এতোগুলো বছর... 'কী কাজ করো তুমি জঙ্গলে'... একবার মাটির দিকে তাকায় সে তারপর বললে 'জঙ্গলের সেবা', ট্রাক্টর আর জলের ট্যাঙ্ক নিয়ে আর্টিফিশিয়াল ওয়াটার পিটগুলোতে জল ভরে সে। জলই জীবন... সেই সব বইতে পড়া কথাগুলোর সদর্থক রূপকার আজ চোখের সামনে। শশীনভাই বলে ওঠেন... 'ভয় করেনি কোনোদিন তোমার... জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ' ... 'নাহ', ও ঘাড় নাড়ে তারপর জড়ানো মারাঠি ভাষায় বলে, গাছের ডাল থেকে তেন্দুয়া ওর ট্র্যাক্টরের ছাতে লাফিয়েছিল একবারই। দেড়শোটা পিট আছে জঙ্গলের ভেতরে, সামনাসামনি হয়েছে তেন্দুয়া, ভাল্লুকের আর বাঘেরও, তবে কেউ কিছু বলেনি কোনওদিন।

জঙ্গলের গল্প শুরু করলে শেষ করা যায়না আর জঙ্গলের মানুষদের গল্প সে আমার কাছে বড় বিস্ময়ের, বড় আনন্দের ... পিটেঝরী গেটের বাইরে চায়ের দোকানের চম্পাবাঈ... চিনে রেখেছে আমায় একবার দেখেই... ফিকা চহা বানিয়ে দিল... (চিনি ছাড়া চা), ওর বদ্ধমূল ধারণা, আমি বনদফতরের লোক, তাডোবার জঙ্গলের বাঘ এখানে যে ছাড়া হতে পারে সেটা দেখাশুনা করতেই নাকি আমি আসি। গেটের বাইরে বেরিয়ে আজ যখন ওর চায়ের দোকানে বসেছি, আবার একবার পাশে

একজন বসেছিলেন চায়ের গ্লাস হাতে, বাঘের কথা শুনে মুখ তুলে থাকালেন... চম্পাবাঈ পরিচয় করিয়ে দেয়... "মাস্টারজি"। পরিচয় বিনিময় হয়, জানতে পারি পিটেঝরী সরকারি স্কুলের শিক্ষক উনি, হরিশ কাভগাটে, সাইকেলে চেপে সকালে বিকেলে ঘুরে বেড়ান এই জঙ্গল ঘেরা পথে, নিত্যদিন... এখানেই ঘরবাড়ি ... বললেন, 'বাইশ বছর হয়ে গেল শহরে আর যাওয়া হয়নি'... আমি যোগ করি, 'প্রয়োজনই হয়নি হয়তো', উনি হাসেন।
গেটের পাশে রাখা ছিল ধনলালের সাইকেলটা... সেটা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল... আমাদের সঙ্গে ছিল ও কয়েকটা দিন... গাইড হিসেবে ওর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে... রাজুদা চা খেতে ডাকল ওকে... শশীন ভাই জিজ্ঞেস করেন... बिबट्या इथेच आहे हे तुम्हाला कसे समजले... (তুমি কি করে বুঝলে যে তেন্দুয়াটা এই দিকেই রয়েছে)... ধনলাল একবার আকাশের দিকে তাকায় আর তারপর কিছু না বলে একমুখ হাসে। বুঝি ওর অনুভব অভিজ্ঞতা... সেটা হয়ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেনা... ফিরাক গোরখপুরীর দুটো লাইন আমার বড় প্রিয় এখানে বসে সেটাই মনে পড়ল...
बहुत पहले से उन क़दमों की आहट जान लेते हैं
तुझे ऐ ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं
(বহুৎ পহেলে সে উন কদমো কী আহট জান লেতে হ্যয়
তুঝে এ জিন্দেগী হম দূর সে পহেচান লেতে হ্যয়)
রোজ অবশ্য গাইডের কাজ জোটেনা... রোটেশন আসতে দিন তিনেক তো লাগেই, সামান্য জমি জমা আছে, চাষ আবাদই মূল জীবিকা বলেছিল সে আগেই... হাসছিল ধনলাল ... হাত তুলে বিদায় জানায়, আবার হয়ত কেউ জঙ্গলে এলে যখন তার ডাক আসবে ও, আবার বুঝতে পারবে আহট... মৃদু শব্দ পদচারণার।
অল্প দূরে একদল কচিকাঁচা, জঙ্গলের আশেপাশে পড়ে থাকা কাগজ, প্ল্যাসটিক বোতল তুলে বস্তায় ভরছে কয়েকজন, একটা হাতঠেলা নিয়ে আরো দুজন অল্পবয়সী... পাশে একজন মাঝবয়সী মানুষ, মাথায় টুপি, চোখে চশমা, হাত ভরতি খালি মদের বোতল, বিয়ারের ক্যান... কুড়িয়ে বস্তায় ফেললেন। আমরা তাকিয়ে ছিলাম, মাস্টারজি বললেন 'এনাকে চেনেন তো... কিরণ পুরন্দরে সাহেব।'

"নাগজিরা এক প্রেম কথা"... ইউটিউবে ওঁর ভিডিও দেখেছিলাম, একটানা চারশো দিন নাগজিরার জঙ্গলে কাটিয়েছেন... হাতের তালুর মতো চেনেন এই জায়গাটা... পক্ষীমিত্র বলেই এখানে ওঁকে চেনেন সবাই। ছুটে যাই পরিচয় করি একটা ছবি তুলি একসঙ্গে অনুমতি নিয়ে... সামান্য আলাপচারিতা, বললেন, 'পুণের সবকিছু ছেড়েছুড়ে স্বামী স্ত্রী এখন পিটেঝরীতেই', জঙ্গলকে ভালোবেসে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রকৃতিপাঠে ব্যস্ত রেখেছেন, শেখাতে চেষ্টা করছেন যে জঙ্গল বাঁচলে তবেই মানুষ বাঁচবে। প্রকাশ আর একবার পিটেঝরী গেটের দিকে যায়, পূজা ম্যাডামকে 'বাই' বলে আসি বলে। যাওয়ার সময় আলাপ হয়েছিল, সঙ্গে বন দফতরের কর্মী, নান্দেড়ে বাড়ি, এতো কঠিন পদবী উচ্চারণ করতে পারিনি, মনে আছে আমার। অনেকটা সময় নিচ্ছে প্রকাশ, তারপর দেখি লাফাতে লাফাতে বেরিয়েছে সে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে লটারি জিতেছে। বলল, 'জেনে এসেছি 1st bird survey at Nawegaon-Nagzira Tiger Reserve, From 20 Jan 2023 to 23 Jan 2023, এই দেখো ফর্ম', তারপর বললে 'চলো নাম দিয়ে দি ফর্মটা ভরে ফেলি।' শশীনভাই চোখ বুলিয়ে দেখে বলেন, এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াতে পাশ মার্ক জুটবে না... তারপর পড়ে শোনান...নাহ এজন্মে আর হলনা... রাজুদা ঘাড় নেড়ে বলে সামনের মাসে আমার বাষট্টি হবে। প্রকাশের মুখের দিকে তাকাই আমাদের দলে বয়সে সবচেয়ে ছোট ও... ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি...
आहिस्ता - आहिस्ता बढ़ रही हैं
चेहरे की लकीरें...
शायद नादानी और तजुर्बे में
बंढवारा हो रहा है...
(আহিস্তা- আহিস্তা বড় রহী হ্যয়
চেহরে কী লকীরে
শায়দ নাদানী ঔর তজূর্বে মে
বাটোয়ারা হো রহা হ্যয়।)

চেনা... ইনিই কালকে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোঈ লাক'... এবার আমার পালা, পালটা প্রশ্ন করি, 'কোঈ লাক'... ভদ্রলোককে বলতে না দিয়ে পাশের মাঝবয়সী মহিলা বলে ওঠেন হাত পা নেড়ে , খুবই উত্তেজিত হয়ে... मी एक बिबट्या पाहिला आहे, आज मी पहिल्यांदाच जंगलात आलो आहे... বুঝি উনি তেন্দুয়া দেখেছেন প্রথমবার কেনো জঙ্গলে এসেছেন সেটা জানাতে ভোলেননা। ভদ্রলোক পরিচয় করান – 'মেরি আক্কড় সাস।' শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। প্রকাশ উদ্ধার করে, বলে মিসেসের বড়ো বোনকে বলে... আক্কড় সাস।
এবার ফেরার পালা... কোনও জায়গা ছেড়ে আসতে একটু মন খারাপ লাগে, ওই পিছুটান... প্রকাশ বলল, 'পতঝড় কে মৌসম মে চলতে হ্যয় দাদা... পান্না টাইগার রিজার্ভ'...
গুগলে সার্চ করে রাজুদা তারপর বলে, 'পান্না সির্ফ দশ ঘন্টেকা জার্ণি... করীব করীব পানসো কিমি... লম্বা দূরী থোড়ি না হ্যয়।'
আমি ঘাড় নাড়ি, এবার মনটা খুশি খুশি...
গেয়ে উঠি...
मुझे आवाज़ देती है हवाएं जंगलों की रे...
বাকিরা গলা মেলায় -
मुझे आवाज़ देती है हवाएं जंगलों की रे
जंगल मांगे धूप पानी
धूप पानी बहने दे...
(মুঝে আওয়াজ দেতী হাওয়ায়ে
জঙ্গলো কী রে
মুঝে আওয়াজ দেতী হাওয়ায়ে
জঙ্গলো কী রে
জঙ্গল মাঙ্গে ধূপ পানি
ধূপ পানি বহেনে দে...)
(গুলজার সাহেব) প্রকাশ বলে ওঠে..."No road is too long when you have good company"।
গিয়ার বদলে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দেন শশীনভাই, গাড়ি ছুটতে থাকে ফেরার পথে।

দেব মুখার্জি চন্দননগরের, কর্মসূত্রে এখন তিনি প্রবাসী। ভ্রমণ তাঁর পেশার অন্তর্গত, নেশাও বটে। দীর্ঘসময় ধরে কাজে অকাজে ঘুরে বেড়িয়ে, সেই পথ চলার কিছু কথা, অল্পকিছু বছর আগে শখ করেই লিখেছিলেন ফেসবুকে। মাঝেমধ্যে কোনো লিটল ম্যাগাজিন বা ই-বুক অথবা কোনও সংকলনে কিছু লেখা ছাপাও হয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি গল্পসংকলন 'পাড়ি'। 'আমাদের ছুটি'-র জন্য কলম ধরলেন এই প্রথম।

Comments

Name

উত্তরাখণ্ডে ট্রেক

মৃণাল মণ্ডল

~ *কেদারনাথ যাত্রার আরও ছবি* ~

~ পূর্বপ্রকাশিতের পর ~

যতকাণ্ড কেদারনাথে...

গৌরীকুণ্ডের পথে

গাড়িতে অসীমার বরাবরের সমস্যা। পিছনের দিকে বসলে গা গোলায়। জানলা না খোলা থাকলে সমস্যা হয়। এইসব। তাই ও সবসময় গাড়ির সামনের সিটে বা মাঝখানের সিটে জানালার ধারটায় বসতে চায়। আর গাড়িতে ওঠার আধঘণ্টা আগে অ্যাভোমিন চাই-ই-চাই। ট্রেকের সময় যে মেয়ে ঘোড়ার মতো ছোটে, গাড়িতে উঠলেই সে জব্দ হয়ে যায়।
আমারও গাড়িতে একটা সমস্যা আছে। কোনোকিছু খেয়ে গাড়িতে উঠলেই (বিশেষ করে চকোলেট, চিপস্, কোল্ডড্রিংকস বা ভারী কোনো খাবার) খুব তাড়াতাড়ি অ্যাসিডিটি হয়ে যায়। আর বমি করে ফেলি। তাই গাড়িতে বড়ো কোনো দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার আগে সাধারণত কিছুই খাই না। দরকার হলে গাড়িতে বসে শুধু মুড়ি আর জল। ব্যস। বাকি খাবার নামার পর। তাতে আমার আবার বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না।
যাই হোক, আমাদের এবারের দলের সবার সঙ্গে সবার মেলবন্ধন খুবই ভালো। সবাই সবার সুবিধা বা অসুবিধা খেয়াল রেখে গাড়িতে চড়েছিলাম। তাই বড় একটা অসুবিধা হচ্ছিল না। আমাদের সকলের প্রিয় সন্দীপদার একটা ভালো অভ্যেসের কথায় এবারে আসি। দাদা প্রত্যেক অভিযানের শুরুর থেকে সবরকমভাবে প্রস্তুতি নেয়। যখন পরিকল্পনা চলে দাদা তখন চারপাঁচটা পেনড্রাইভ জোগাড় করে ফেলে। আর তাতে ভরে ফেলে বিভিন্ন দশকের, বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন মুডের গান। যা সমস্ত অভিযান জুড়ে গাড়িতে চলার সময় বাজতে থাকে আবার বিভিন্ন মুডের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধরণও পরিবর্তিত হতে থাকে। এই ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক সময়, অনেক পরিশ্রম ও ধৈর্য্যর প্রয়োজন। যা দাদা হাসিমুখে একার দায়িত্বে আয়োজন করে। তার জন্য আমার মতো অভিযাত্রীদের সবাই-ই দাদাকে বাহবা দেয়। কারণ ট্রেকের ক্লান্তি কিছুটা দূর করতে এ এক দারুণ ঔষধ।

এই যাত্রাতেও তার অন্যথা হল না। গানের তালে তালে দুলে দুলে চলতে শুরু করলাম। আর গাড়ি তরতরিয়ে এগিয়ে চলল কেদারের পথে। কিন্তু গানেরও একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে ক্লান্তি উপশমের। তার ওপর আবার অনেকেরই হাঁটার অভ্যেস তেমন নেই। আর প্রথম ট্রেকেই ৩৮ কিমি হাঁটতে হয়েছে (যারা পাণ্ডবগুহা গিয়েছিলাম তারা আবার ৬ কিমি আরও বেশি)। তাই সবাই-ই নিজের আসনে বসে থেকেই যে যার মতো খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল। ড্রাইভারের পাশে বসে অসীমাই কেবল ঠিকভাবে ঘুমিয়ে পড়তে পারছিল না। দীর্ঘপথ যাত্রায় গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে যে বসে তার ঘুমালে চলে না। কারণ ঘুম অতি ছোঁয়াচে রোগ আর ড্রাইভারের তন্দ্রাভাব এলে সবার বিপদ।

গাড়ি এগিয়ে চলল নিজের ছন্দে। আমাদের ড্রাইভার মোমিন ক্রমাগত পানমশলা চিবাতে চিবাতে গাড়ি চালাতে লাগলেন। পিচঢালা কুড়িফুটের ফাঁকা রাস্তা। পাহাড় কেটে তৈরি করা। রাস্তার মাথার ওপর পাহাড়ের কাটা অংশ ঝুলছে বিপজ্জনক ভাবে। রাস্তার বামদিক থেকে গা ঘেঁষে যেন ঝুলে আছে। আর ডানদিকে নীচে খাদের মধ্যে দিয়ে গর্জন করতে করতে বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। কে বলবে যে এই ইনিই গোমুখের গুহায় যেখানে জন্মেছেন সেখানে দুগ্ধপোষ্য শিশু (নালার মতো)।
যাইহোক গাড়ির গতি কখনই তিরিশ-চল্লিশের বেশি উঠছিল না। মাঝে মাঝে রেগে যাচ্ছিলাম মনে মনে। কারণ যা পরিকল্পনা করে এসেছি এই গতিতে চললে তার হেরফের হয়ে যাবে। বারংবার গতি একটু বাড়াতে বলা সত্ত্বেও মোমিন যেন কানেই নিচ্ছিলেন না। তাই বিরক্ত হয়ে একসময় বলা বন্ধ করে দিলাম। ৪৭ কিমি চলার পর দাবরানি এবং আরও ৬

কিমি চলার পর গঙ্গানী এলো। আর গঙ্গানী থেকে গাড়িতে বসেই দূরে ঋষিকুণ্ড মন্দিরের এক ঝলক দেখতে পেলাম। গাড়ি কিন্তু থামল না। এগিয়েই চলল। আরও ৪৪ কিলোমিটার চলার পর উত্তরকাশিতে পৌঁছলাম। উত্তরকাশি বেশ বড়ো একটা শহর। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, খেলার মাঠ, বড় বাজার, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, এটিএম সব রয়েছে এখানে। জমজমাট শহর বলা চলে। আর একেবারে সমতলে - গঙ্গার কোলে। গাড়ি থামালাম। চা আর হালকা স্ন্যাক্স খাওয়া হল। কেউ কেউ এটিএম থেকে টাকা তুলে নিল। তারপর বেশি সময় নষ্ট না করে আবার গাড়িতে উঠে পড়লাম। উত্তরকাশি থেকে ওল্ড তেহরি পর্যন্ত ৭০ কিমি পথের দুপাশ বেশ জমাটিই রইল। প্রচুর দোকান, হোটেল, বাজার, জনবসতি। আসলে চিন্নলিশ্বরের ২ কিমি পর থেকে ওল্ড তেহরি পার করে গাড়োলিয়ার ২-৩ কিমি আগে পর্যন্ত বিস্তৃত বিখ্যাত তেহরি জলাধার রয়েছে - রাস্তার সঙ্গে সমান্তরালে বামদিক ঘেঁষে। তাই এই জমাটি ব্যাপারস্যাপার। গাড়োলিয়ার পর শ্রীনগরের পথে না গিয়ে একটু শর্টকাট নিলাম। অন্য পাহাড়ের অন্য রাস্তা ধরে। তাই মুহূর্তে জমাটি ভাবটা উবে গেল।

গাড়োলিয়ার পর ১৬ কিমি গিয়ে ঘানশালি থেকে গাড়ি ডানদিকে বাঁক নিল। তারপর আরও ৫৭ কিলোমিটার চলে সন্ধ্যে আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ তিলওয়াড়া পৌঁছে গেলাম। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আর এগোনো সম্ভব ছিল না। তাই একটা হোটেল খুঁজে নিলাম। হোটেলের পিছনের দিকের তিনটে ঘর নিলাম আমরা। আমি, অতনু, অসীমা আর রাখি একটা ঘরে। সন্দীপদা আর অনসূয়া একটায়। সোমাঞ্জন, অভিজিৎদা একটাতে। ব্যবস্থা হল। ড্রাইভারের আলাদা ব্যবস্থা করে দিল হোটেল কর্তৃপক্ষ। সবাই ফ্রেশ হয়ে একপ্রস্থ চা খেলাম। তারপর হোটেল সংলগ্ন দোকান থেকে আমরা কিছু সব্জি কিনলাম। সন্দীপদা ভেন্ডি খেতে চাইল। তাই ভেন্ডি নেওয়া হল। হোটেল থেকে সেই ভেন্ডি রান্না করে দিল। আমরা রুটি, ভাত, ওমলেট, ভেন্ডির তরকারি সব মিলিয়ে রাতের আহার সেরে ঘরে ঢুকলাম। অনেকটা পথ গাড়ির ধকল, সবার এক ঘরে না থাকা, পরের দিনের কেদারের ট্রেক মাথায় রেখে এখানে নৈশ আড্ডা বসল না। খাওয়ার ঘরে একটু আলোচনা করে, সকালে যে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে সে কথা বলে, ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পরের দিনের গোছগাছ মোটামুটি সেরে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়েও পড়লাম। আলো নেভানোর পর ঘুম আসতে দেরি হল না বেশি।

পরের দিন সকালে প্রাতঃরাশ সাঙ্গ করে হোটেলের বিল মিটিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। প্রথম গন্তব্য সোনপ্রয়াগ। তিলওয়াড়া থেকে গুপ্তকাশি হয়ে সোনপ্রয়াগ। মোট ৬২ কিলোমিটার পথ। গুপ্তকাশির কাছে রাস্তা মন্দাকিনীর গা ঘেঁষে। একই সমতলে। এখানে মন্দাকিনীর আল রাস্তার মাঝখানে হেলিপ্যাড - কেদার যাওয়ার। জায়গাটা ভীষণই সুন্দর। পাইনের জঙ্গলে ঘেরা। গাড়ি থেকে নামলাম একটু ঘুরে দেখতে। একপাল ভেড়া এসে জুটল কোথা থেকে। তারা রাস্তা পার হয়ে পাহাড় বেয়ে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঠে গেল আপন ছন্দে।

গাড়ির রাস্তা আবার খাড়াই হতে শুরু করল। বাকি পথ একইরকম থাকল। অর্থাৎ রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়। অপর দিকে গিরিখাত। তার অপরপাশে অন্য পাহাড় উঠে গেছে ওপরের দিকে। গিরিখাতে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী নদী, স্বমহিমায়। এই মন্দাকিনী গোটা রাস্তাকে যেন পথ চিনিয়ে নিয়ে গেছে সেই রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত। তারপর অলকানন্দার হাতে এই গুরুদায়িত্ব সঁপে দিয়ে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত কলেবরে অলকানন্দার ক্রোড়ে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তারপর অবশ্য অলকানন্দাও দেবপ্রয়াগে গিয়ে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। আর ভাগীরথীর সাথে মিশে গঙ্গার বক্ষে বিলীন হয়েছে। সে এক ইতিহাস। আর পৌরাণিক মাহাত্ম্য ও মহাকাব্যিক তাৎপর্যও তার বিরাট। সে গল্প না হয় সময় পেলে বৈঠকি ঢঙে বলা যাবে আরেকদিন। বরং এবারের অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে চলি। কারণ কেদার পৌঁছনোর তাড়া আছে !

যাই হোক সোনপ্রয়াগের পর এ গাড়ি এগোবে না। কারণ সোনপ্রয়াগের ব্রিজের ওপাশে এপাশের গাড়ির অনুমতি নেই। তাই আমরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ ব্যাগ নিয়ে ব্রিজ পেরোলাম। এই গাড়িটা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত। মোমিনকে খাওয়ার জন্য কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে এগোলাম। ব্রিজের উল্টোদিকে দুই ধরণের গাড়ি পাওয়া যায়। দশ আসনবিশিষ্ট টেম্পো ট্রাভেলার ও সাধারণ সাত আসন বিশিষ্ট সুমো। ট্রাভেলারে চড়ে বসলাম। জনপ্রতি পনেরো টাকা করে ভাড়া। দশজন যাত্রী দেখতে দেখতে হয়ে গেল আর আমাদের গাড়ি রওনা দিল গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। এখানে বলে রাখি ট্রেক ছাড়াও কেদার যাওয়ার অন্য উপায় আছে। হেলিকপ্টারে যাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চল ট্যুরিজম এর হেলিকপ্টার পবন-হানস্ ছাড়ে অগস্ত্য মুনি, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে। কেদারনাথ হেলিকপ্টার সার্ভিসেসের হেলিকপ্টার ছাড়ে তিন জায়গা থেকে। সিরসি, ফাটা ও গুপ্তকাশী হেলিপ্যাড থেকে। এই সার্ভিসে যুক্ত কোম্পানিগুলি হল আরিয়ান, থাম্বি অ্যাভিয়েশান প্রাইভেট লিমিটেড, পবন হানস, উতাইর ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্দো কপ্টার প্রাইভেট লিমিটেড ও হিমালয়ান হেলি। এদের সবারই কেদার পৌঁছাতে দশ পনেরো মিনিটের বেশি লাগে না। ভাড়া একমুখী যাত্রায় পঁচিশশো-এর কাছাকাছি। আর দ্বিমুখী যাত্রায় সাতচল্লিশশো থেকে হাজার পাঁচেকের মধ্যে। প্রসঙ্গত দেরাদুন থেকেও হেলি পরিষেবা আছে।

সোনপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ডের রাস্তা আরও সংকীর্ণ। পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলাচল করে বটে কিন্তু বিপজ্জনকভাবে। পাহাড় কেটে এ রাস্তা তৈরি। তাই অত্যন্ত ধ্বসপ্রবণ। রাস্তার ধার ঘেঁষে নেমে যাওয়া ঢাল আরও খাড়াই। আর ধারের দিকের পাথর অধিকাংশ জায়গায় বেশ আলগা। খাদের মন্দাকিনী আরও খরস্রোতা।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। এ রাস্তায় বৃষ্টি খুবই বিপজ্জনক। ধ্বসপ্রবণতা বাড়িয়ে দেয় বহুলাংশে। পিচের রাস্তাও পিচ্ছিল। আর রাস্তা সাপের মত একে বেঁকে চলেছে যার বাঁকগুলো হৃদকম্প ধরানোর জন্য যথেষ্ট। একচুল এদিক ওদিক হলেই নিচের খাদে। আর ঘটনাও তাইই ঘটেছে দেখলাম। একটা বাঁক নিয়ে সামনে এগোতেই জোরে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সামনে পুরো বাঁক জুড়ে গাড়ির লাইন। আর বাঁকটা বেশ অনেকখানি। পুরো একটা ইউ-প্যাটার্নের। তাই উল্টোদিকের বাঁকও চোখের সামনে উন্মুক্ত। সেই বাঁকের ঠিক আগেই রাস্তার উপর একটা ছোট্ট জটলা। ওখান থেকে একটা বাস পড়ে গেছে খাদে - মন্দাকিনী বক্ষে। হতাহতের সঠিক হিসেব কেউ বলতে পারল না। আধঘন্টা আগে হয়েছে এই ঘটনা। ডিজাস্টারের টিম এল বলে। এখানে খবর দিলে উদ্ধারকারী দল চলে আসে খুবই দ্রুত। দল এসে আগে দড়ি দিয়ে বেঁধে কয়েকজন সহ ড্রাফটিং বোট নামিয়ে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে শুরু হল রাস্তা ফাঁকা করার কাজ। পনেরো মিনিটের মধ্যে জটলা ফাঁকা করা হল আর দাঁড়িয়ে পড়া গাড়িও চলতে শুরু করল। আমাদের গাড়িও এগিয়ে চলল গন্তব্যে, বিপজ্জনক এই স্মৃতিকে পিছনে ফেলে রেখে। দেখতে দেখতে ৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেলাম গৌরীকুণ্ড। যেখান থেকে শুরু হবে আমাদের পায়ে হাঁটার সফর। যা গাইডবুকের হিসাবে ১৮ কিলোমিটার। স্থানীয় হিসাবে বাইশ-তেইশ। আর এক প্রৌঢ় তথা স্থানীয় বাসিন্দার মতে কম-সে-কম ২৬ কিলোমিটার। কারণ প্রকৃত দূরত্ব বলে দিলে নাকি অভিযাত্রীদের মনোবল নষ্ট হয়!

~ ক্রমশঃ ~

~ *কেদারনাথ যাত্রার আরও ছবি* ~

হাওড়া জেলার অঙ্কুরহাটি কিবরিয়া গাজি উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক মৃণাল মণ্ডলের নেশা ভ্রমণ, খেলাধূলা ও সাহিত্য চর্চা।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment | Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ওকাম্পোর দেশে

শ্রাবণী ব্যানার্জী

কলকাতাতে যখন বড় হচ্ছিলাম তখন আর্জেন্টিনা দেশটির নাম শুনলেই কেন জানি না রবীন্দ্রস্নেহধন্যা অভিজাত পরিবারের 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো'-র নামটাই চোখের সামনে ভেসে উঠত।
ব্রাজিলে কার্নিভাল দেখতে গিয়েছিলাম তাই ভাবলাম সেই দক্ষিণ গোলার্ধেই যখন যাচ্ছি তখন একসঙ্গে আর্জেন্টিনারও কয়েকটা জায়গা সেরে আসা যাক। কিছু নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়দের টিভিতে দেখে, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কথা পড়ে, ম্যাডোনার 'এভিতা' সিনেমাটি দর্শন করে এই দেশটিকে দেখার ইচ্ছা ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল, তাছাড়া ব্রাজিল আর্জেন্টিনার বর্ডারে ইগুয়াজু ফলস্ আর গ্লেসিয়ার-এর আকর্ষণ তো আছেই।
ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই রিও থেকে প্লেনে ইগুয়াজু পৌঁছে গেলাম। আমাদের ব্রাজিলের দিকের হোটেলটা প্রায় ন্যাশনাল পার্কের মধ্যেই থাকায় সোজা টিকিট কেটে ঢুকে পড়া গেল। সারি সারি মাথাবিহীন বাসে প্রায় মিনিট পনেরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটি বড় কাঠের পাতাটনের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। জঙ্গলে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি, প্রজাপতি ছাড়াও বেশ কিছু বড় কাঠবেড়ালিকেও প্রচন্ড গতিতে আশেপাশে ঘুরতে দেখলাম। এসব জায়গায় বেশি স্ন্যাক্স নিয়ে যাওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় কারণ একটির মুখে দেখলাম গোটা পটেটো চিপস-এর প্যাকেট শোভা পাচ্ছে।

এই কাঠের পাটাতনগুলি ধরে চলতে চলতে ফলস্-এর একেবারে কাছেই চলে আসা যায়। ব্রাজিল-এর দিকে জলের তোড় আর্জেন্টিনার মত না হলেও প্রায় তিনশোটা জলপ্রপাতের সমন্নয়ে এই প্যানোরামিক ভিউটি দৃষ্টিগোচর হলেই দেখবেন বিস্ময়ে মুখটা আপনা থেকেই হাঁ হয়ে যাচ্ছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় এ একেবারে নায়াগ্রা ফলস্-এর বাবা। একদা আমেরিকার ফার্স্ট লেডি এলিনর রুজভেল্টের মতনই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'পুওর নায়াগ্রা'। কথিত আছে, এ তল্লাটের এক বিরাট ক্ষমতাশালী দেবতা নাকি নাইপি নামক এক মনুষ্যসুন্দরীর প্রেমে পড়েন, বেচারীর আর একটি প্রেমিক বর্তমান থাকায় সে দেবতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। প্রেমিকযুগলকে নৌকো নিয়ে পালাতে দেখে দেবতা ক্ষেপে গিয়ে

মস্তানদের মত ব্যবহার করেন তাহলে খামোখা আর মর্তের মানুষগুলোকে দোষ দিয়ে লাভ কী বলুন?

পরের দিন আর্জেন্টিনার দিক থেকেও ফলসটিকে দেখতে পেলাম। এদিকটায় আবার জলের তোড় এমনই যে মনে হয় যেন কোনও বড়সড় দৈত্য ধেয়ে আসছে বিশেষ করে 'ডেভিলস থ্রোট' দেখলে তো কথাই নেই। রেনকোট পরে কাছে যাওয়ার আগেই মনে হল এর দাপটেই বোধহয় উড়ে যাব। কায়দা করে যে সেলফি তুলবেন সে সম্ভাবনাও নেই বড়জোর অতীতে টিভিতে দেখা নিজেকে সেই লিরিল সাবানের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন বলে মনে করতে পারেন। উনিশশো চুরাশি সালে এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আখ্যা পায়। এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে পুয়ের্তো গিয়ে ইগুয়াজু আর পারানা নদীর মিলনস্থল ছাড়াও একই সঙ্গে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা আর প্যারাগুয়ের বর্ডার দেখারও সৌভাগ্য হল।
পরের দিন সোজা প্লেনে চেপে বিকেলের মধ্যেই রাজধানী বুয়েনস আইরেস্ শহরটিতে পৌঁছে গেলাম। ষোলোশো শতাব্দীতে স্পেন থেকে যখন জাহাজে চেপে ইউরোপিয়ানরা আসে তখন নোঙর ফেলার জন্য এই জায়গাটা বেশ উপযুক্ত মনে হওয়ায় তারা নাম দেয় 'বুএনস আইরেস' স্প্যানিশ ভাষায় যা হল ভালো বা অনুকূল বায়ুপ্রবাহ। ঠিক ছিল পরের দিন সকালেই আবার প্লেন নিয়ে পেরিতো মেরিনো গ্লেসিয়ারটি দেখে ফিরে এসে বেশ সময় করে এই শহরটাকে ঘুরে দেখব। তাই সে রাতটা নষ্ট না করে সোজা মাদেরো ট্যাঙ্গো দেখতে জলের ধারে গিয়ে হাজির হলাম, নাচের সঙ্গে অবশ্য খানাপিনার ব্যবস্থাও ছিল। প্রায় দেড়শো বছর আগে এদেশে কিছু আফ্রিকান ক্রীতদাস ও নিম্নশ্রেণীর সাদাদের সমন্বয়ে এই যুগল নৃত্যটির জন্ম হয়, এখন অবশ্য সারা পৃথিবী জুড়েই এর ব্যাপ্তি।

আর জনগণ গম্ভীর হয়ে গেলে আমিও গাম্ভীর্য অবলম্বন করলাম। ভাষা না বোঝার শতেক জ্বালা। তবে ডিনারটি সুস্বাদু হওয়ায় নাচা গানা খানা পিনা নিয়ে মোটের ওপর সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কাটলো। ভাবলাম পরেরদিন ভোরবেলাতেই প্লেন নিয়ে গ্লেসিয়ারটা দর্শন করে আসি তারপর আবার নাহয় এই শহরটিতেই ফিরে আসা যাবে।
ঘণ্টাতিনেক প্লেন যাত্রা করে পরেরদিন সুন্দর এক ছোট্ট পাহাড়ি জায়গায় এসে পৌঁছোলাম যার নাম এল-কালাফাতে। ছবির মতো সুন্দর রাস্তাঘাট, ছোট ছোট কাঠের কটেজ, তারি মধ্যে একটি আমাদের হোটেল। এককথায় গাছপালা দিয়ে ঢাকা জায়গাটি ভারি মনোরম। রাস্তার ধারে একটি ছোট্ট দোকানে দেখলাম গণেশের মূর্তিও রাখা আছে।

সেদিন বিকেলেই লেক আর্জেনতিনোর উল্টোদিকে Glaciarium বা আইস মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। গ্লেসিয়ারের উৎপত্তি থেকে ধীরে ধীরে তার বিস্তার খুব সুন্দরভাবে এখানে ফুটিয়ে তুলেছে। পরেরদিন সকালে ট্যুর বাস এসে আমাদের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট – লস গ্লেসিয়ারেস ন্যাশনাল পার্কের দিকে নিয়ে চলল। পাহাড়ি সৌন্দর্য ছাড়াও প্রায় দুশোটা হিমবাহ এখানে দেখা যায় কারণ এই পার্কের অর্ধেকটা জুড়েই রয়েছে পাতাগনিয়া আইস ফিল্ড আর তার মধ্যেও সবথেকে সুন্দর 'পেরিতো মেরিনো' গ্লেসিয়ার।

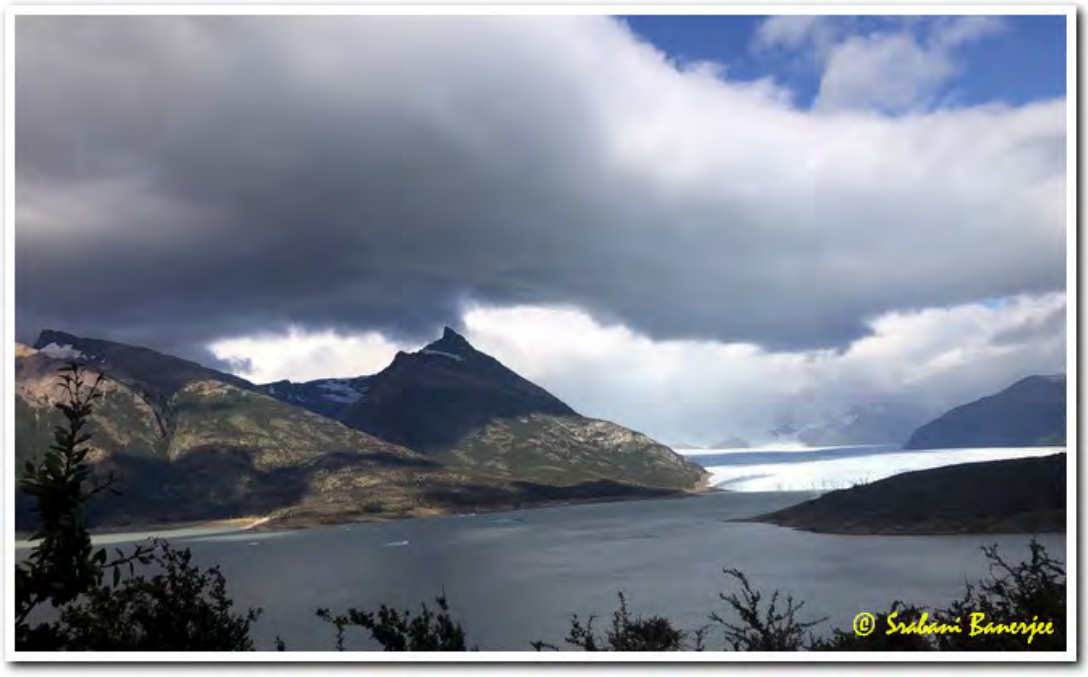

পৃথিবীর বেশিরভাগ গ্লেসিয়ার যখন গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে তাদের কলেবরটি ক্রমশ খাটো করে যাচ্ছেন তখন এই তিরিশ কিলোমিটার লম্বা গ্লেসিয়ারটি প্রতিদিন নিজেকে প্রায় দু মিটার করে বাড়িয়ে যাচ্ছেন। কাঠের পাটাতন দিয়ে হাঁটতে

জলের ওপর দিয়ে আমাদের লঞ্চ যখন আরও কাছে নিয়ে গেল তখন দেখি কয়েকটা জায়গা থেকে হালকা নীল টিউব লাইটের মতো আলো বেরোচ্ছে আবার কোনও কোনও জায়গায় ঝলক দিচ্ছে কমলা রংয়ের দ্যুতি, সে এক অপরূপ দৃশ্য। আলাস্কাতে হিমবাহ দেখে আমার ঠিক এই অনুভূতি হয়নি, তাই ক্যামেরাতে কিছুটা ধরা পড়লেও এর বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এইভাবেই কোথা দিয়ে যে ঘণ্টা সাতেক কেটে গেল কে জানে! পরেরদিন আবার প্লেন নিয়ে বুয়েনস আইরেস্ ফিরে গেলাম কারণ এরপর কয়েকদিন এই শহরটিকেই ভালো করে দেখার পালা।

পরেরদিন শহরটি দেখতে গিয়ে সত্যিই প্রায় চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। চারিদিকে নিও-ক্লাসিকাল ধাঁচের সুন্দর সুন্দর বাড়ি, মাথা ঘোরানো সব চওড়া রাস্তা, দারুণ সাজানো পার্ক, আলো ঝলমলে কাফে আর দামি দোকানের সারি। শুনেছিলাম এই শহরটিকে নাকি প্যারিসের অনুকরণে সাজানো হয়েছিল যদিও চারিদিকে অজস্র ইতালিয়ান ও স্প্যানিশ ছাপও দেখলাম। আমি একেবারেই এতটা আশা করে আসিনি, তাই বোধহয় চমকটা একটু বেশিই লাগল।

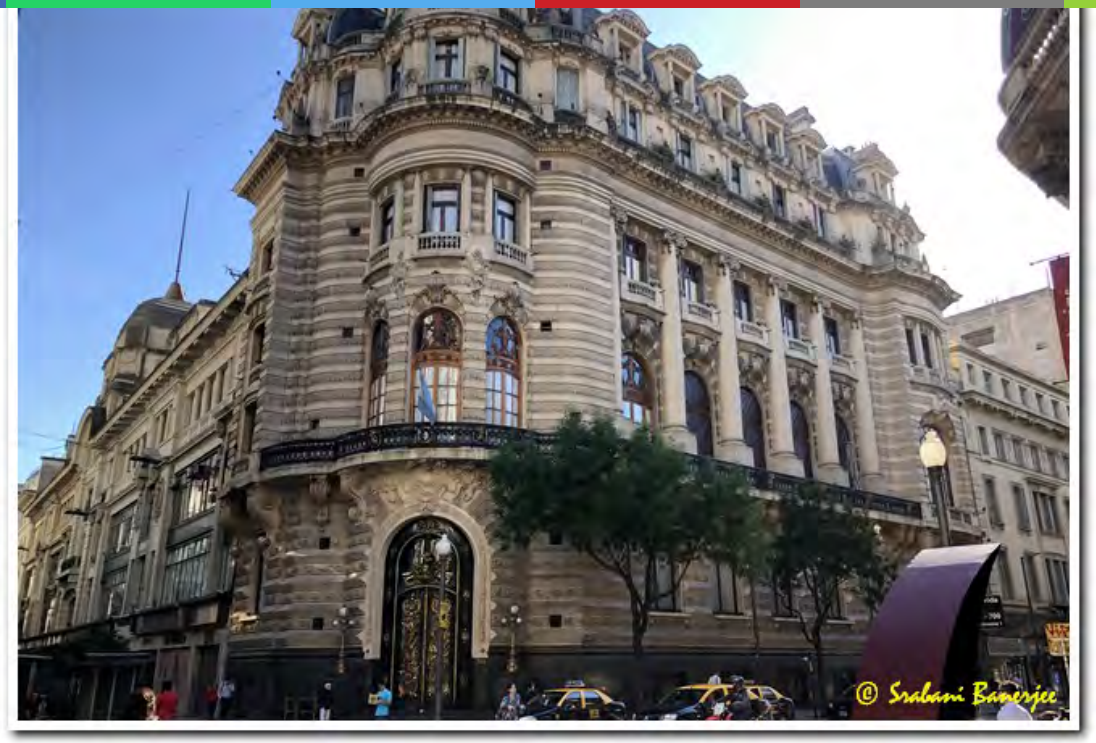

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যদিও দেশটি চামড়া, মাংস, গম, পশম এসব বিক্রি করে অত্যন্ত বড়লোক ওঠে কিন্তু তারপর থেকেই এদেশের পতন ঘটতে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি এতটাই দেনায় ডুবে আছে যে ব্যাংকে টাকা ভাঙাতে গেলেও দেখবেন বারবার হোঁচট খাচ্ছেন। আজ ডলার ভাঙাতে গিয়ে যা টাকা পাবেন পরের দিন দেখবেন ঢের বেশি পাচ্ছেন আর সত্তর শতাংশ সুদের হার ধরলে তো কথাই নেই। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট 'হুয়ান পেরণে'র সময় থেকেই এদের দিন খারাপ হতে থাকে। একটু বেশি মাত্রায় জনদরদি হওয়ায় উনি আর ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ইভা পেরণ শ্রমিক ও গরিব সম্প্রদায়ের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অর্থনীতির অবস্থা ক্রমেই মন্দার দিকে যেতে থাকে, তার ফলে ওঁদের বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ইভা পেরণ ক্যান্সারে মারা যান, আজও অবশ্য এদেশে তিনি বেশ জনপ্রিয়। সঙ্গীত শিল্পী ম্যাডোনা 'এভিতা'চলচিত্রে ওঁর ভূমিকায় 'ডোন্ট ক্রাই ফর মি আর্জেন্টিনা' গানটি বড় চমৎকার গেয়েছিলেন। উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে তিরাশি পর্যন্ত সামরিক শাসক হুনতার অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহু অল্পবয়সি ছেলেমেয়েও রাস্তাঘাট থেকেই গায়েব হয়ে যায়। আজও দেখবেন মায়েরা তাদের ফিরে আসার আশা নিয়ে রাস্তায় মোমবাতি জ্বালিয়ে যিশুর কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। এদেশে প্রায় সবাই রোমান ক্যাথলিক, বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস্‌ও এদেশেরই বাসিন্দা ছিলেন।

সাতানব্বই শতাংশ জনগণই এদেশে শ্বেতাঙ্গ আর এতবড় দেশে জনসংখ্যাও সাড়ে চার কোটির বেশি নয় তবুও অর্থনীতির অবস্থা খুবই সঙ্গীন, কিন্তু আশপাশ দেখলে বোঝে কার সাধ্যি। এই শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল প্লাজা দে মাইও বা মে স্কোয়ার।

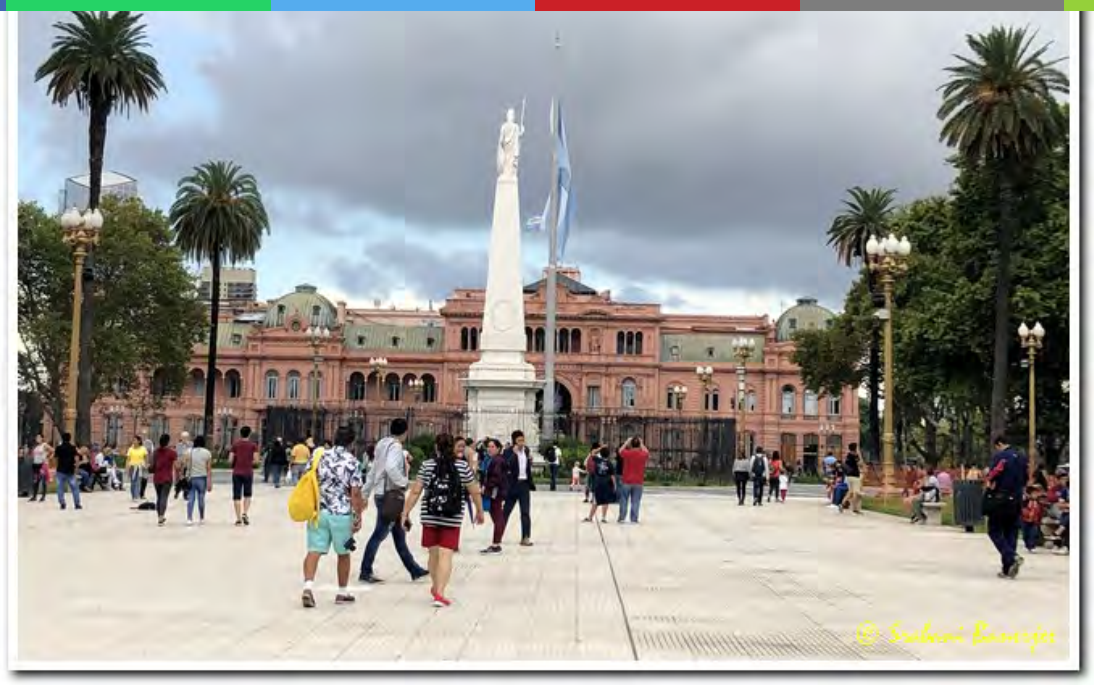

১৮১৮ সালে স্প্যানিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার পর এই দু ব্লক জুড়ে জায়গাটাকে রাজনৈতিক দপ্তর, সুন্দর সুন্দর মিউজিয়াম ও গাছপালা ফোয়ারা দিয়ে দারুণ করে সাজানো হয়। তার মধ্যে ইতালিয়ান ধাঁচে তৈরি 'কাসা রোজাদা' অর্থাৎ গোলাপি রংয়ের রাষ্ট্রপতি ভবনটি চোখে পড়ার মতো। সামনে একটি বিরাট স্মারক স্তম্ভ নিয়ে জায়গাটা যেন আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগোলেই চোখে পড়বে এক মাথা-ঘোরানো চওড়া রাস্তা আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুন্দর ওবেলিস্ক।

এই ৪৬০ ফিট্ চওড়া জুলাই ৯ বা ন নম্বর হুলিও নামক রাস্তাটি এতটাই চওড়া যে চোখ পিটপিট করে রাস্তা পেরোতে গিয়ে বার তিনেক ট্রাফিক লাইটেই আটকে গেলাম। প্যারিস-এর Champs Elysees-এর প্রায় দুগুণ চওড়া, এক দুই তিন করে রাস্তা গুনতে গুনতে অবশেষে ষোলোতে এসে ঠেকে গেলাম।
মে এভিনিউ দিয়ে চলতে চলতে 'অভেনিদা' থিয়েটার হল, দুপাশে সুন্দর সুন্দর কাফে বিশেষ করে 'তরটিনী' যা কিনা এদেশের সবথেকে পুরোনো কাফে দেখে তাই লোভ সামলাতে না পেরে পেস্ট্রি খেতে ঢুকে পড়লাম। খেয়ে মনে হল এ যেন অস্ট্রিয়ান পেস্ট্রির থেকে বেশি উপাদেয়। রাস্তায় এক অদ্ভুত দর্শন বাড়ি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, গাইড বলল এই বাইশ তলা বাড়ির নাম 'বারোলো'।

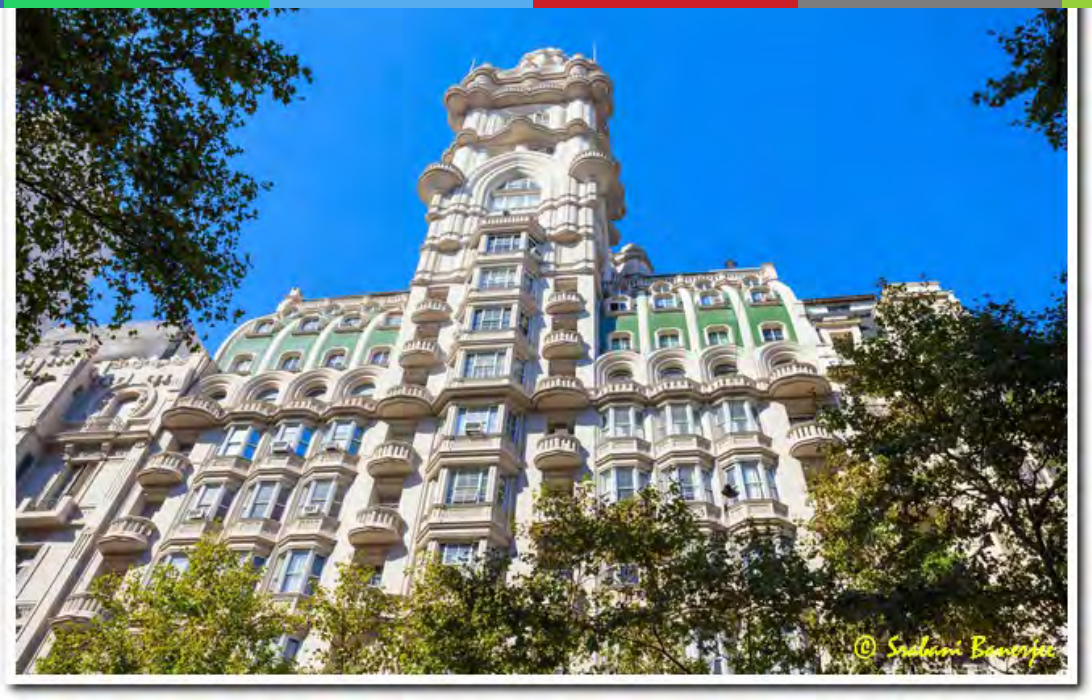

উনিশশো তেইশ সালে এক ইতালিয়ান আর্কিটেক্ট নাকি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' পড়ে এই বাড়িটিকেই পুরগাতোরিও অর্থাৎ শোধনকারী হিসাবে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ভাগ করে তৈরি করেছিলেন, বাড়ির দুটো তলা মাটির নীচে বা পাতালে তাই সেটা নাকি নরক। এক থেকে পনেরো তলা মর্ত্য অর্থাৎ মাঝামাঝি জায়গায় নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ষোলো থেকে সোজা স্বর্গের দিকে হাঁটা দেবেন। বাইশ অর্থাৎ একবার পেণ্টহাউস পৌছে গেলেই স্বর্গের রাস্তা খোলা। কে জানে হয়তো এই সিম্বলিজম আমাদের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
শুনেছিলাম ফ্লোরিডা স্ট্রিট শপিং-এর স্বর্গ তাই সেদিকেই হাঁটা দিলাম। এদের বিখ্যাত চামড়ার ব্যাগ কিনে একসময় কফি খেতে বসে পড়লাম। বাংলায় কথা বলতে শুনে ঈশিতা নামক একটি বাঙালি মেয়ে অন্য টেবিল থেকে তার স্প্যানিশ বন্ধুদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চলে এল। যদিও আইটির দৌলতে ভারতীয়রা এখন সারা পৃথিবী জুড়েই বিদ্যমান তবুও এদেশে তারা এখনও সংখ্যায় খুব কম তাই মাতৃভাষা শুনে এত আনন্দ। বেচারা জানাল এখানে একটা ছোটো ইন্ডিয়ান স্টোর আছে বটে কিন্তু পোস্ত-র কোয়ালিটি আদৌ সুবিধের নয়।
পরের দিন পুরোনো বন্দরের পাশে 'লা বোকা' নামে এক সাংঘাতিক রংবেরংয়ের জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম কোথাও প্রমাণ সাইজের পুতুল দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে আর কোথাও বা পুরো রাস্তার মেঝেটাই রঙিন ছবি দিয়ে ঢাকা এছাড়া দেওয়ালের গায়ে ম্যুরাল তো আছেই।

নীল হলুদ জার্সির রঙে সাজানো 'বোকা জুনিয়র'স্টেডিয়ামের সামনে দেখলাম বেঁটেখাটো মারাদোনার একটি মূর্তি, তাঁর জীবন নাকি এই গরিব পাড়া থেকেই শুরু হয়। 'মেসি' আসার আগে ফুটবল তারকা হিসাবে মারাদোনাই ছিলেন এদের

বুয়েনস আইরেস্-এর আর একটি জমজমাটি জায়গা 'সান তেলমো', যদি একবার সেখানে রবিবারে গিয়ে পৌঁছতে পারেন তাহলে দেখবেন চারিদিকেই মেলা বসেছে আর লোকজন ফুর্তিতে রাস্তাতেই ট্যাঙ্গো নেচে যাচ্ছে।

সেখান থেকেই প্রায় আধঘণ্টা ট্যাক্সিতে চেপে এখানকার বিখ্যাত 'ডন হুলিও' রেস্তোঁরাতে পৌছলাম। বহুদিন আগে থেকে রিজার্ভেশন না করলে এখানে জায়গা পাওয়া অসম্ভব কারণ এর নাম নাকি সারা পৃথিবীর প্রথম কয়েকটি রেস্তোঁরার মধ্যে রয়েছে। রিজার্ভেশন থাকা সত্ত্বেও লাইন দিতে হওয়াতে তেনারা রাস্তাতেই কিছুটা করে শ্যামপেন আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। যারা বিফ স্টেক খেতে ভালবাসেন এদেশ তাদের স্বর্গ। প্রায় চারঘণ্টা ধরে ঢিমে আঁচে মসলা মাখিয়ে বার্বিকিউ বা পারিয়া তৈরি করা হয় তাই এত স্বাদ, এদের ওয়াইন-এর সম্ভার দেখলেও মাথা ঘুরে যায় কারণ আর্জেন্টিনা ওয়াইন-এর জন্যও বিখ্যাত।

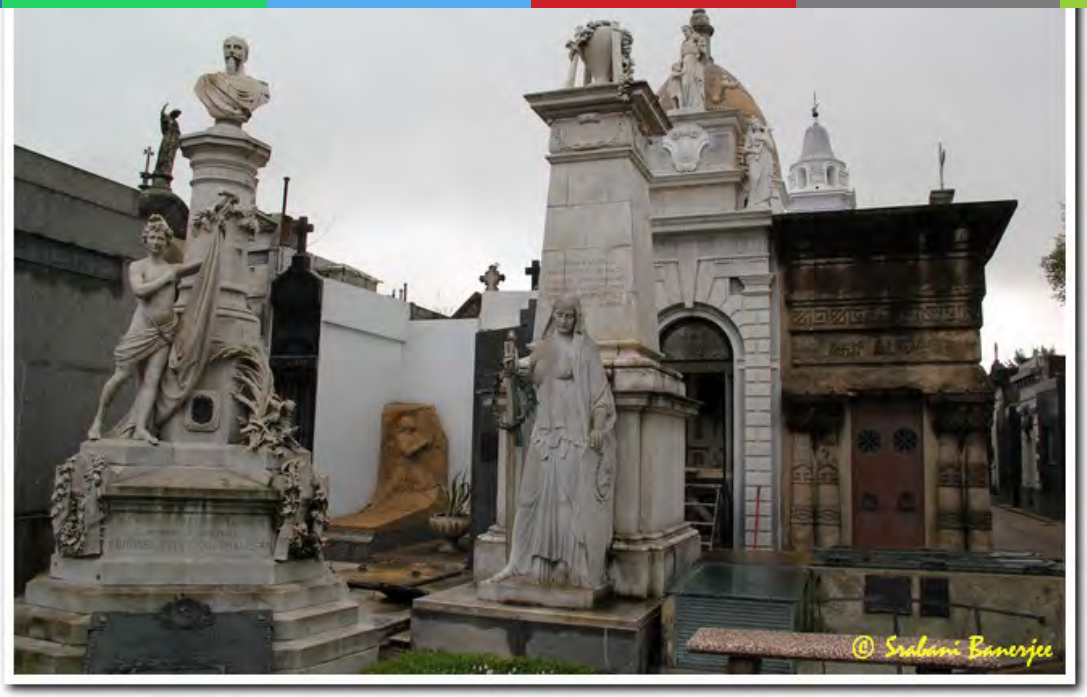

শহর থেকে একটু দূরে রেকোলেটা জায়গাটি স্থাপত্যকলার আর এক চমৎকার নিদর্শন, ইতালি থেকে একসময় এখানে আনা হয় ছয় হাজারের ওপর ভাস্কর্য। এখানকার বিখ্যাত সমাধিস্থলে ইভা পেরণ থেকে রবীন্দ্র স্নেহধন্যা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সবার সমাধিই দেখতে পাবেন। তাই এই দেশটিকে বিদায় জানানোর আগে সেই বহুশ্রুত ভিক্টোরিয়া বা 'বিজয়া'র বাড়ির দিকেই রওনা হলাম।

ভিক্টোরিয়া ছিলেন একজন নারীবাদী লেখিকা ও সাহিত্য সমালোচক। 'সুর' নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন - ইংলিশ, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ানও তিনি মাতৃভাষার মতনই জানতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও কোনও স্কুল কলেজে যাননি কিন্তু বাড়িতে ঢের বেশি পড়াশোনা করেছিলেন। ইংল্যান্ড-এর রাজপরিবারের পুরস্কার ছাড়াও কলম্বিয়া হার্ভার্ড-এর মতো বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীও সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি তার হাতে তুলে দেয়। শোনা যায় ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়ে তিনি রীতিমতো রবীন্দ্র অনুরাগী হয়ে পড়েন। ১৯২৪ সালে পেরু মেক্সিকো ভ্রমণের পথে যখন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আর্জেন্টিনাতে বিরতি নিতে বাধ্য হন আর সেটা জানতে পেরে ভিক্টোরিয়া তাঁর নিজের বাড়িতে কবিকে এনে দুমাস রেখেছিলেন। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে প্লাতা নদী আর তার ধরে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখে যাচ্ছেন কবিতা আর তাঁর পায়ের কাছে বসে আছেন ভিক্টোরিয়া।

অবশেষে ট্রেনে করে আমিও একসময় বুয়েনস আইরেস্ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সান ইসিদ্রোতে সেই বিশাল বাড়িটির সামনে পৌছে গেলাম। এখন অবশ্য ভিলা ওকাম্পো ইউনেস্কোর সম্পত্তি কারণ বিশ্বের কবি সাহিত্যিকরা আজও

হল আমিও যেন মানসিকভাবে সেই সময়টাতে ফিরে গেছি।

ভিক্টোরিয়া বাংলা জানতেন না কিন্তু অবাক হয়ে দেখতেন কবিতার কাটাকুটি থেকে কি চমৎকার ছবি তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাই বারবার জিজ্ঞাসা করতেন রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন না কেন। পূরবী গ্রন্থের এই কাটাকুটি থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকার প্রেরণা জোগান আর অনেক পরে ১৯৩০ সালে প্যারিস-এর বিখ্যাত গ্যালারি 'পিগালে'তে ভিক্টোরিয়া রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এই ছবি প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আর একটা দিক আমাদের কাছে খুলে গেল।

প্রথম যখন দুজনের দেখা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়েস তেষট্টি আর ভিক্টোরিয়ার চৌত্রিশ কিন্তু মানসিক ভাবে তাঁরা এতটাই কাছাকাছি চলে এসেছিলেন যে এটিকে অনেকে প্লেটোনিক লাভ আখ্যা দিয়ে থাকেন। সান ইসিদ্রোর 'মিলারিও'বাড়ির বারান্দায় আর কখনও বা তিপা গাছের ছায়ায় বসে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়াকে নিজের কবিতা ইংরাজিতে তর্জমা করে শোনাতেন আর ভিক্টোরিয়া তাঁর পায়ের কাছে মুগ্ধভাবে বসে থাকতেন।

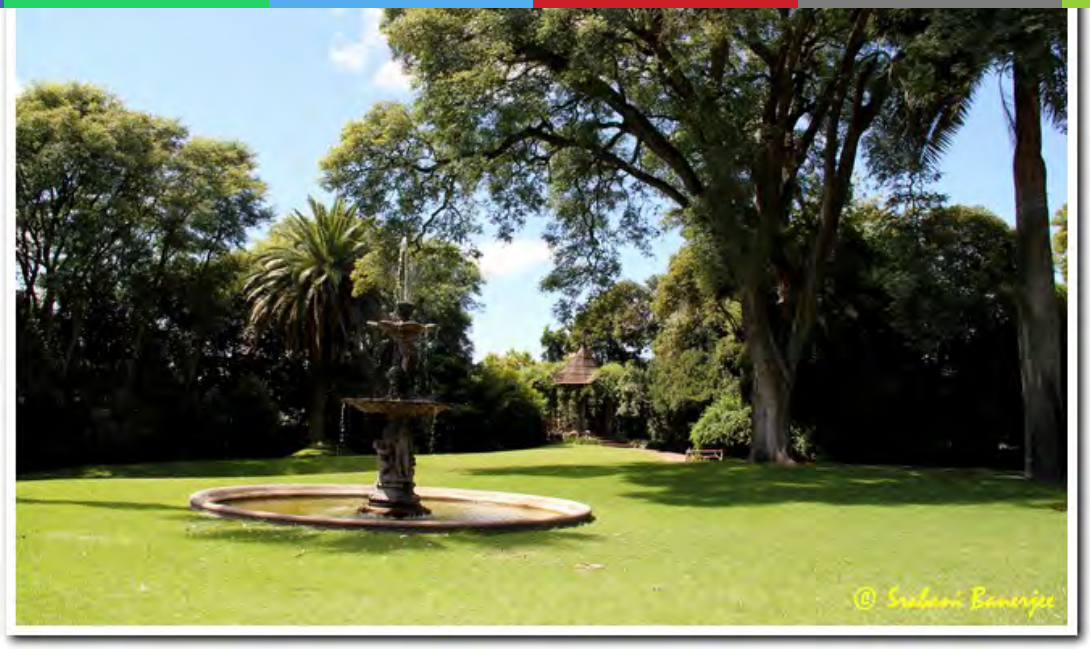

একসময় ভিক্টোরিয়াও লিখে ফেললেন যা বাংলা করলে হয় – 'সান ইসিদ্রো উপত্যকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। বিদায় জানানো কারোর পক্ষেই খুব সহজ ছিল না তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমায় শুধাই 'বলো দেখি
মোরে ভুলিবে কি'
হাসিয়া দুলাও মাথা; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে,
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা –
মোরে ভুলিবে না।

'পূরবী' গ্রন্থ উৎসর্গ করে ভিক্টোরিয়া বা বিজয়াকে শান্তিনিকেতন থেকে চিঠিতে লিখলেন – তুমি তো জানো সেই আমাদের উজ্জ্বল দিনগুলি যা ধরা দিয়েছে আমার কবিতায় তাই হয়তো এটিই হবে আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। লেখাটা শেষ করার আগে 'বিদেশী ফুল'-এর আরও কয়েকটা লাইন এখানে তুলে দিলাম -

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম –
'কী তোমার নাম',

আর কিছু নয়
হাসিতে তোমার পরিচয়।

শ্রাবণী ব্যানার্জির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইতিহাস পাঠ ও সঙ্গীত-চর্চাতে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

শ্যামদেশের চাও ফ্রায়া নদী

মার্জিয়া লিপি

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিজিওনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। ইউএসএইড বাংলাদেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রকল্প থেকে মোট আটজন প্রতিনিধি আমরা কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করি। সে উপলক্ষ্যেই আমার প্রথমবারের মতো ব্যাংককে যাওয়া। দিনটা ছিল ২৭ অক্টোবর, সময়মতো বিমানবন্দরে হাজির হলাম। নির্ধারিত সময়ে - থাই এয়ারলাইন্স পাখা মেলে দেয় নীল আকাশে। রোদ ঝলমলে নীলের মাঝে সাদা রঙের পেঁজা তুলার মতো মেঘ ভেসে যায় দূর আকাশে। এয়ার হোস্টেসের হট ক্লিয়ার থাই স্যুপ আর গ্রেপস জুসের উষ্ণ আতিথেয়তা শেষ হতে না হতেই ব্যাংকক সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে পৌছালাম। সেখানে তখন বিকাল পাঁচটা। বাংলাদেশ সময় বিকাল চারটে। আকাশে ভাসতে ভাসতে কখন যেন এক ঘন্টার সময় গরমিল হয়ে যায়। সূবর্ণভূমি বেশ বড় এয়ারপোর্ট। সুসজ্জিত সুবর্ণভুমির আলোঝলমলে করিডোর পেরিয়ে পৌঁছে গেছি এক মাথা থেকে আরেক মাথায়। হাঁটছি, কখনও চলন্ত রাস্তায় এগোচ্ছি। সুন্দর সাজানো – আধুনিক সব ব্যবস্থা। এয়ারপোর্টে ডলার বিনিময় মূল্য কিছুটা কম; থাই মুদ্রা ১ বাথের বিনিময় মূল্য ২.৮ বাংলাদেশি টাকা। মোবাইল ফোনের সিম কিনতে গিয়ে কিছুটা সময় কেটে যায়। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সেরে কনফারেন্সে অংশ নিতে আসা সকলেই সাদা একটি মাইক্রো বাসে চড়ে বসলাম। গন্তব্য র‍্যাচাপ্রসং এর হোটেল আনান্তরা সিয়াম।

রাস্তায় কিছুটা যানজট রয়েছে। প্রথমবারের মতো আসা একসময়ের শ্যামদেশ আর বর্তমানে থাইদেশের রাজধানী শহর ব্যাংককে। চারপাশের সবকিছুকেই দেখছি অতি আগ্রহী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। বিস্তৃর্ণ খোলা জায়গা রাস্তার দুধারে। পথে পথে অনেক বড় বড় শপিংমল। বহুতল প্রাসাদ আর বাণিজ্যিক ভবন সাজানো রয়েছে রাস্তার দুপাশে - নানারকমের নকশায় শৈল্পিক সাজে। ড্রাইভার চ্যাঙ শেন থাইল্যান্ডের স্থানীয় অধিবাসী। ইংরেজী ভাষায় তেমন স্বচ্ছন্দ নয়; তবে আমাদের সঙ্গে কোনোরকমে ভাববিনিময়ে হোটেল পৌঁছে দেয়। তখন প্রায় ঘড়ির কাঁটায় সময় রাত আটটা। এয়ারপোর্ট সুবর্ণভুমি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে পাতমে অবস্থিত কনফারেন্সের জন্য নির্ধারিত হোটেলটি। আমাদের থাকার ব্যবস্থা পাঁচ তারকা খচিত হোটেল আনান্তারা সিয়াম-এ। আনান্তারার প্রবেশের পথেই রাখা ভেলভেটের মতো উজ্জ্বল জারুল রঙের অর্কিড। রঙবেরঙের অর্কিডের দেশ থাইল্যান্ড। এই শহরটি শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং দৈব প্রকৃতির মিলিত রূপ। লবির বেগুনী রঙের অর্কিডের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে থাই পোশাকের দুজন গোলাপী চিবুকের মেয়ে অভ্যর্থনা জানায় আমাদের। মোট চার দিনের বুকিং ছিল হোটেল সিয়ামে। যদিও কনফারেন্স শেষের তিন দিন থেকেছিলাম সুকুম্বির হোটেল রিজেন্সিতে। থাইল্যান্ডে ঘুরতে এলে সাধারণত বাংলাদেশিরা সুকুম্বিতে অবস্থান করে। ৫০০/৬০০ বাথ-এ হোটেল পাওয়া যায় এ এলাকায়। সহকর্মী রাজু আমাদের জন্য অনলাইনে হোটেল বুকিং করে রেখেছিল ১২০০ বাথ-এ। পাঁচতারায় থাকার পর পরবর্তী দিনগুলোতে সুকুম্বির হোটেলটিতে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল অনেকটাই কম। খুব স্বাভাবিক ভাবেই টাকার মানের সঙ্গে বৈভব আর স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কিত। ব্যাংককের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ও মার্কেটে শপিং করতেই সময় চলে যায়। রাতটুকুই শুধু আমাদের হোটেলে থাকা।

থাইল্যান্ড বা তাইল্যান্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রটির সরকারি নাম তাইরাজ্য (থাই: ราชอาณาจักรไทย রাচ্ আঁণাচক থাই অর্থাৎ "তাই রাজ্য")। থাইল্যান্ডের বৃহত্তম শহর ও রাজধানীর নাম ব্যাংকক। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দেশটি নাম ছিল শ্যামদেশ (থাই: สยาม সায়াম)। পরবর্তীতে এর নাম বদলে হয় থাইল্যান্ড ।

ব্যাংকক যাত্রার পূর্বে উইকিপিডিয়া আর গুগল থেকে কিছু সাধারণ তথ্য জেনেছিলাম - থাইল্যান্ড একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। সংবিধানে রাজাকে খুব কম ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জাতীয় পরিচয় ও ঐক্যের প্রতীক রাজা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থাই জাতির মানুষ থাই ভাষাতে কথা বলে। ৫ বর্গ কিমি-র কিছু উপরে ব্যাংককের আয়তন। কৃষি, পর্যটন, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যাবসা থাই জনগণের। শিক্ষার হার ছেলেদের – মেয়েদের শতভাগের কিছুটা কম। প্রায় সবাই থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম পালন করে। থাইল্যান্ডে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির মধ্যে আছে চিনা, মালয় ও আদিবাসী পাহাড়ি জাতি, যেমন মং ও কারেন।

থাইল্যান্ডের মধ্যভাগে রয়েছে একটি বিস্তীর্ণ উর্বর সমভূমি। সমভূমির মধ্য দিয়ে দেশের প্রধান নদী চাও ফ্রায়া এবং এর বিভিন্ন শাখানদী - উপনদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে। মধ্য অঞ্চলের উর্বর সমভূমিতে দেশের ধান ও অন্যান্য ফসলের অধিকাংশের আবাদ হয়।

ব্যাংককের প্রথম রাতে আমাদের তেমন কিছুই দেখার সুযোগ হয়নি। হোটেলে চেক ইন করে ডিনার শেষে শুধুমাত্র সিয়াম আনান্তারার থেকে বের হলাম পায়ে হেঁটে একনজরে শহরের রাতের সৌন্দর্য দেখার উদ্দেশ্যে। হোটেলের লবি থেকে সামনের দিকে তাকালেই স্কাইট্রেনের স্টেশন র‍্যাচাপ্রসং। সিয়ামের প্রবেশ পথের শুরুতেই মাথার ওপরে র‍্যাচাপ্রসং স্কাইওয়াক দেখে মনে হলো যাক যেখানেই যাই না কেন অনন্ত স্কাইট্রেনে ফিরে আসতে পারব হোটেলে। নিকটস্থ সিয়াম সেন্টার এবং সিয়াম প্যারাগন মলগুলি রাত দশটায় বন্ধ হয়ে যায় তবে রাতচাপ্রসং মোড়ে ইরাওয়ান মাজার কমপ্লেক্সে টুরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে। হপ্তাখানেক সময়ে দেখা ব্যাংকককে মনে হয়েছে যেন পর্যটকদের মনের মতো হওয়ার জন্যে চারপাশে পশরা মেলে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে।

বৈচিত্র্যময় আয়োজনের জন্যে ভ্রমণপিপাসুদের পছন্দের তালিকায় অন্যতম থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক। রোমাঞ্চকর ভ্রমণের জন্য থাইল্যান্ডের খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। অনেক বড় বড় প্রাসাদ-অট্টালিকার ভিড়, শপিং মল, আকাশছোঁয়া স্কাইট্রেনে চোখের পলকে শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলা – এসব কিছুই এ শহরের বৈশিষ্ট্য। শপিং করার জন্য সস্তা কিছু রাতের মার্কেটও রয়েছে ব্যাংককে। কী নেই এই দেশে! আধুনিক শহরের আলোর ঝলকানি থেকে শুরু করে পাহাড়ের ভাঁজে ছোট্ট গ্রাম আর বিশাল সমুদ্রের ঢেউ এর গর্জন, বেলাভূমি, কোরাল দ্বীপ, ওয়াকিং স্ট্রিটে লাইফ ড্যান্স শো, মিউজিক শো, বার, স্ট্রিট ফুড আর ম্যাজিক শো সহ হরেক আয়োজন রয়েছে এ রাজধানীর পথে প্রান্তরে। নির্জন প্রকৃতি ভ্রমণ আর শহুরে হইহুল্লোর সব কিছুর সমাহারে ব্যাংকক সমৃদ্ধ। আর রয়েছে ট্রাফিক জ্যাম। এই একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঢাকা শহরের মিল রয়েছে। পর্যটকদের আকর্ষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এ শহরের নানা প্রান্তে - বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে – গ্র্যান্ড প্যালেস, সাফারি ওয়ার্ল্ড, চাও ফ্রায়ায় রিভার ক্রুজ, ওয়াট অরুন, ওয়াট ফ্রা কাইয়াগ, লুম্ফিনি পার্ক, বেঞ্চিকিতি পার্ক, চায়না টাউন, ব্যাংককের সর্বোচ্চ ভিউপয়েন্ট মাহানাখোন স্কাইওয়াক, মাদাম ত্যুসো মিউজিয়াম, শাখা নদীতে নৌকায় ভাসমান ফুল ও সবজির বাজার, আয়ুতাহায়া হিসট্রিক্যাল পার্ক ইত্যাদি।

অনেক আকর্ষণের ভিড়ে চাও ফ্রায়া নদীর পারের এলাকাটি পৃথিবীজোড়া পর্যটকদের প্রিয় একটি গন্তব্য। নদী জড়িয়ে থাকা এই শহরটিতে রয়েছে অনেক মন্দির এবং আশ্চর্য সব স্থাপত্য – আয়ুথায়া শহর, ব্যাং পা-ইন সামার প্যালেস এবং ওয়াট চাই ওয়াট্টানরম – এরকম নানা কিছুর ঠিকানা। ব্যাংককের বাণিজ্যপথ চাও ফ্রায়া নদী। নদীতে নৌকা বিহারেই এই শহরটিকে সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায়। বিকেল থেকেই এখানে জমতে শুরু করে দশনার্থীদের ভিড়। হই-হুল্লোড় লাইভ মিউজিক, ক্লাবিং, নাইট শপিং চলে গভীর রাত অবধি।

ব্যাংকক থেকে চাও ফ্রায়া নদীর ধারে গড়ে উঠেছে পর্যটন এলাকা এশিয়াটিক দ্য রিভারফ্রন্ট। পূর্বে ইস্ট এশিয়াটিক কোম্পানির ডক হিসেবে ব্যবহৃত হত এ ঘাট। ২০১১ সালে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি টিসিসি ল্যান্ড এ স্থানটিকে বিনোদন এবং পর্যটনের জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার দ্বায়িত্ব নেয়। নতুন করে সংস্কার করে এই এলাকা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত

দুই কিনারে গড়ে ওঠে নয়ানাভিরাম বিভিন্ন স্থাপত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব পর্যন্ত এখানেই বাণিজ্য চলে।
এশিয়াটিক স্কাই রাউন্ডে চড়ে চাও ফ্রায়া নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এখনও নদীর ঘাটে ডেনিশ স্থাপনার মতোই বিভিন্ন ডেক রয়েছে। নদীর পাড়ে কাঠের ডেকে হেঁটে বেরিয়ে নদীর দুপাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর আলোকসজ্জায় চাও ফ্রায়ায় স্নিগ্ধ সন্ধ্যার রূপ যেন, আলো ঝলমলে। নৌকাবিহারেই রয়েছে ক্যালিপসো শো। এই শোতে থাইল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী নাচগুলো প্রদর্শন করা হয়। সব বয়সীদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের রাইড।
ইচ্ছে করলে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায় প্যালেস চত্বরে। চায়না টাউন পেরিয়ে চাও ফ্রায়া রিভার সাইডে। সমস্ত নগর নদীর মতো চাও ফ্রায়ার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে রাজধানী ব্যাংককের ইতিহাসের সঙ্গে। চাও ফ্রায়া নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে খাল খনন করে একটি কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করা হয়। ব্যাংককে অভিহিত করা হয় 'প্রাচ্যের ভেনিস' নামে। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা অনেক লেখক চাও ফ্রায়াকে দূর প্রাচ্যের অন্যতম প্রিয় জায়গা বলে অভিহিত করেন। ব্যাংককের মাঝখান দিয়ে চাও ফ্রায়া নদী বয়ে গেছে। নদীর একপাড়ে ওয়াট ফো আর অন্য তীরে ওয়াট অরুণ। অসম্ভব শৈল্পিক কারুকাজ জড়িয়ে রয়েছে মন্দিরের গায়ে গায়ে। সংস্কার কাজের জন্য বড় চূড়াটি ঢেকে রাখা। বনসাই দিয়ে বিভিন্ন নকশা করে রাখা মন্দিরের বাইরের চত্বরটি। সন্ধ্যায় বিভিন্ন সময় ধরে রিভারক্রুজ চলে – দুইতলা একটা জাহাজের মতো। নির্ধারিত সিটে বসার পর যাত্রা শুরু করে ঘড়ির কাঁটা মেনে। কী নেই সেখানে – ক্যাফে, আলো ঝলমলে মার্কেট, লাইভ মিউজিক আর সঙ্গে বুফে খাবার। দুপাশের রাতের ব্যাংকক দেখতে দেখতে জাহাজ এগোতে থাকে রাজহংসীর মতো ডানা মেলে। পুরো জলবিহারই যেন রঙ-বেরঙের আলোর বুক চিরে এগিয়ে যায়। দুপাশের স্থাপনার ঝলমলে আলোর প্রতিফলনে চারপাশকে মনে হয় স্বপ্নপুরী। চাও ফ্রায়া নদীর বুকে প্রায় দেড় ঘন্টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার তীরে ভিড়ল। সেখান থেকে ব্যাংককের জ্যাম ঠেলে হোটেল পৌঁছাতে শরীরে টের পাই ক্লান্তির অবসাদ ।

এর মধ্যেই সুকুন্তিতে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে রিভার প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়। পাশের রেস্তোরাঁয় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম মাইক্রোবাসের জন্য। সন্ধ্যার আগেই মাইক্রোবাস এল। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছিলেন। রাতের ঝলমলে শহর দেখতে দেখতে ড্রাইভার বিশাল ষোলতলাবিশিষ্ট কার পার্কিং-এর ষোল তলায় মাইক্রোবাসটি রাখলেন। সেখান থেকে তিনি আমাদের একটি শপিংমলে নিয়ে গেলেন।
তখন বিকেল পাঁচটা। ড্রাইভার আমাদের চারটি টিকিট দিয়ে বললেন সাতটার দিকে শপিংমলের পাশে অবস্থিত রিভার পোর্টে পৌঁছে যেতে। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম চারপাশ দেখতে দেখতে। সাতটার সময় পোর্টে চলে গেলাম। এরপর দেখলাম বিশাল আকারের একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে যার নাম 'সিলভার মুন'। রাতের আঁধারে নদীর ওপরে সাদা আর নীল রঙের মিশেলে জাহাজটি ছিল অপূর্ব সুন্দর, সঙ্গে ছিল পুরো জাহাজ জুড়ে সাদাটে-নীলচে রঙের মরিচবাতি যা সত্যিই মন ছুঁয়ে যায়। যেন স্বপ্নের আলোর পথে আমি উঠছি।
জাহাজটি ছিল তিনতলাবিশিষ্ট। তিনতলায় উঠে বসি। ওঠার সময় জাহাজের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কেবিন ক্রুরা অভ্যর্থনা জানায়। একদম ধারের দিকে একটি টেবিল আমি আর সহকর্মী বেছে নিই। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দে চারপাশের নীরবতা বিদীর্ণ হয়। কী যে ভালো লাগছিল রাতের শহরটিকে জাহাজে করে দেখতে! এর আগে আমার কখনও শহরের মাঝখান দিয়ে এরকম পরিবেশে 'রিভার ক্রুজ' ভ্রমণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।
নদীর দুধারেই আকাশচুম্বী অট্টালিকা আর আলো এবং মাঝখানে নদী। বাইরের অট্টালিকাগুলোর আলো, জাহাজের সাদা-নীল আলো আর আকাশের চাঁদের আলো সব মিলিয়ে এ ছিল এক অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি। জাহাজের ভিতরে লাইভ কন্সার্টের আয়োজনও ছিল। গান শুনতে শুনতে পরিবেশটা উপভোগ করছিলাম তবে আমার ভালো লাগছিল আলো-আঁধারি প্রকৃতিতে নদীর চারপাশের নাগরিক আয়োজন।

জন্যে। যদিও থাইল্যান্ডের থাই খাবারের স্বাদ আমাদের দেশের থাই খাবার থেকে একেবারেই ভিন্ন। ডিনারের সঙ্গে উপভোগ করছিলাম কনসার্টের সুর। পাশ দিয়ে আরও অনেক জাহাজ আসা যাওয়া করছিল। ব্যাংককের অনেক বিখ্যাত জায়গাও দেখলাম। নদীর ওপর দিয়ে বেশ কিছু বড় বড় রাস্তাসহ ব্রিজ ছিল। যখনই আমাদের জাহাজটির ব্রিজ অতিক্রম করার সময় হচ্ছিল তখনই মাইক্রোফোনে সতর্ক করা হচ্ছিল কেউ যাতে না দাঁড়ায়, সবাই যেন বসে থাকে।
নদীপথে পুরো ব্যাংকক শহরে ঘুরিয়ে দুঘণ্টা পর জাহাজটি আমাদের আবার সেই শপিংমলের পাশে অবস্থিত পোর্টে নামিয়ে দেয়। স্কাই ট্রেনে ফিরে এলাম হোটেল সিয়াম আনান্তারায়। অসম্ভব সুন্দর একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে ছিলাম আমরা।

কৃতজ্ঞতা: আনিসুল হক

লেখক, গবেষক ও পরিবেশবিদ মার্জিয়া লিপি পেশাগতভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল, জলাশয়, প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত আগ্রহ ও কাজের সূত্রে ঘুরেছেন দেশ-বিদেশে । প্রকৃতি আর মানুষের প্রতি বিমুগ্ধতায় নানাসময়ে দেখেছেন চেনা-অচেনা ভূগোল। প্রকাশিত বই - আমার মেয়েঃ আত্মজার সাথে কথোপকথন, একাত্তর মুক্তিযোদ্ধার মা, বাংলাদেশের উপকূল: পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, শেখ হাসিনার শৈশব-কৈশোর, সম্পাদিত গ্রন্থ: সরদার ফজলুল করিম দিনলিপি, মাঃ দুইবাংলার সাহিত্য সংকলন, শিশু বিশ্বকোষ ইত্যাদি।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য *দেখুন এখানে**। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।*

সূর্যাস্তের হাট

তৃষ্ণা বসাক

ডাক বাংলো রোড

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘটনাটা এরকম নয়। বাড়ির গেটের বাইরে পা ফেলে আবাসনের পলাশ গাছটা, একেক দুপুরে সেই আমার পর্যটনকেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিংবা, একটু হেঁটে স্পেন্সার, ডোমিনো'জ ফেলে বাঁদিকে গেলেই বুদের হাট। যেখানে নগরায়নকে তুড়ি মেরে এখনো মাঝে মাঝেই মোরগ লড়াই, ঘুগনির বিকিকিনি আর টিপ চুড়ি সিঁদুরের সম্ভার। সেই বুদের হাট থেকে সূর্যাস্তের হাটে যেতে বেশি সময় লাগে না।
এখানে যাওয়ার কথা হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। ডাক আসছিল তরুণ বন্ধুদের কাছ থেকে। কিন্তু ঠিক ব্যাটে বলে হচ্ছিল না। এই করতে করতে একদিন হাওড়া মেদিনীপুর লোকালে চেপে বসলাম। ১১ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়ল ১২.২৫ মিনিটে। পৌঁছতে চারটে বাজল। নেমে একটা টোটোতে মৃত্তিকা। রানি শিরোমণি টুরিস্ট লজ। এখন নাম মৃত্তিকা টুরিস্ট প্রপার্টি।
আবাসনের গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই মন ভালো হয়ে গেল। সরকারি আবাস কেন্দ্র যেমন হয়, অনেক ফেলা ছড়ার জায়গা। প্রাইভেট হোটেলের তৎপরতা না থাকল, এখানে বেশ একটা গা ছেড়ে দেবার আমেজ আছে। প্রাণের আরাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, পাশেই একটা খুব পুরনো আর পরিত্যক্ত বাংলো চোখে পড়ল। ডাক বাংলো। ১৯০৩। ক্ষয়ে আসা হরফে সালটা দেখে বেশ রোমাঞ্চ জাগে। তার উল্টো দিকে বর্তমানের আবাসের সিঁড়ি থেকে ওপরের বারান্দা ভরে আছে ঝরা শিশু গাছের পাতায়। রোদ পড়ে আসা বিকেলের একটা নিজস্ব নির্জন গন্ধ থাকে। লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই গন্ধ নেবার সময় একটু বেশিই পাওয়া গেল, কারণ ঘরের চাবি লাগছিল না। সরকারি আবাসের এটা এক বিশেষত্ব। প্রচুর স্পেস, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ নেই।

নদীর বুকে সূর্যাস্ত দেখব বলে

ঘরে ঢুকে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নেওয়া। এখনই একদল তরুণ বন্ধু আসবে। তাদের সঙ্গে যাব কাঁসাই নদীর কাছে। কাঁসাই নদীতে সূর্যাস্ত দেখার কথা। তারা আসতে দেরি করে ফেলে, যখন আসে তখন সূর্য ঢলে যায় যায়। গাড়ি নিয়ে এসেছিল কবি অর্থিতা, সে বা তার ড্রাইভার রাস্তা চেনে না। আর বাইকে কম্যান্ডো বাহিনির মতো যাদের সামনে সামনে যাওয়ার কথা ছিল, দুখানন্দ আর অভিষেক, তারা একটু পরে কোথাও যে উধাও হয়ে গেল!
ফোনে ধরা হতে তারা খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে পলিটেকনিকের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে বললাম না?'
কে বলেছে আর কে শুনেছে খোদায় মালুম। সে রাস্তা দিয়ে ঢোকাও হল, আরেকটু এগোলে কলেজ, সেদিকে গেলে নদীর থেকে দূরে যাওয়া হয়, এই আন্দাজে আমরা বাম পন্থা বিবেচনা করলাম। এবার রাস্তা অতি সরু, নদীর নাম তো নেই, গন্ধও পাওয়া গেল না। তবু বুঝলাম নদী আছে খুব কাছেই। কারণ পাশ দিয়ে বাইকে, হেঁটে জোড়ায় জোড়ায় যেভাবে চলেছিল, সামনে নদী না থাকলে এখানে কে আসে? কমন সেন্স, ওয়াটসন কমন সেন্স!
একটি এলোমেলো বড় মাঠ, ইতস্তত লে'জ, কুড়কুড়ের খালি প্যাকেট ঘুরছে হাওয়ায়, নদীর হাওয়ায়। 'সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে

পাঁপড়, চালের পাপড়, রঙিন আলু চিপস- এই সব চোখে পড়ল। আগে নাকি এখানে ছোট পত্রিকাগুলি তাদের সম্ভার সাজিয়ে বসত। শুধু বিক্রির জন্যে নয়। আলোচনা, কবিতা পাঠ - সবই হত। এখন সেসব উঠে গেছে। কবিতা পড়ার লোক কমে গেছে, নাকি এই হাট লোকালয় থেকে দূরে বলে বিক্রিবাটা তেমন হয় না, নাকি পৃথিবী বৃদ্ধা হইয়াছেন? আগে যারা উৎসাহ নিয়ে পত্রপত্রিকা করেছেন, সাইকেলে বা হেঁটে কাঁধে বিশাল ঝোলা নিয়ে আসার মতো যৌবন ছিল, ছিল পাগলামির বয়স, এখন চল্লিশ পেরিয়ে চালশে, রাতদুপুরে কাশি এবং স্বপ্নভঙ্গ। নদী আর কথা বলে না নাকি তাদের সঙ্গে?
সে যাই হোক। কিন্তু হাটে লোক মন্দ হয়নি, বেশিরভাগ অবশ্য সূর্যাস্ত দেখতে এসেছে। 'কংসাবতী' বা কাঁসাই দক্ষিণপশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান নদী। কালিদাসের মেঘদূত ও অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থে এই নদী কপিশা নামে উল্লিখিত। কিংবদন্তি অনুসারে, সমুদ্রের কাছে বাগদত্তা কংসাবতী, কৃষ্ণ দামোদর নদের রূপে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলে কংসাবতী দ্রুত ধাবমান হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়।
পুরুলিয়া জেলার ঝালদা অঞ্চলে প্রায় ৬০০ মিটার উঁচু পাহাড় জাবড়বন কাঁসাই নালার আকারে কংসাবতী নদীর উৎপত্তি। নিকটবর্তী অযোধ্যা পাহাড় থেকে সাহারঝোরা নামে একটি ছোট নালা এরপর বেগুনকুদারের কাছে কংসাবতীতে মিশেছে। তেলদিহি গ্রামের কাছে বান্দু বা বন্ধু নদী কংসাবতীতে পড়েছে।
এরপর কংসাবতী পুরুলিয়া-চান্ডিল রেললাইন পেরিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কিছুদূরে কারমারা নামার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভেদুয়া গ্রাম পার হয়ে এই নদী বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। বাঁকুড়াতেই কংসাবতীর প্রধান উপনদী কুমারী নদীর সঙ্গে এর মিলন। মুকুটমণিপুরে কংসাবতী ও কুমারী নদীর মিলনস্থলে বিখ্যাত কংসাবতী বাঁধ ও জলাধারটি গড়ে উঠেছে।

বাঁধ ছেড়ে বেরিয়ে রায়পুরের পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে মেদিনীপুর জেলার বিনপুর অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কংসাবতী। ভৈরববাঁকী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এরপর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে এই নদী। কেশপুরের কাছে নদী দুটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। একটি শাখা দাশপুর অঞ্চলের ওপর দিয়ে পালারপাই নামে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণ নদের দিকে এগিয়ে গেছে ও অপর শাখাটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কালিয়াঘাই বা কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।
কাঁসাই বা কংসাবতী নদী এই জায়গাটায় চওড়া থেকে সরু হয়ে গেছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে রবীন্দ্রনাথের আঁকা রহস্যময়ী নারীর মতো দেখায়। দুপারে গাছের সিল্যুয়েট। এই সূর্যাস্তের হাটে এখন এদিক ওদিক বিপজ্জনকভাবে পড়ে আছে মদের খালি বোতল, এমনকি কাচের টুকরো। রাতে এখানে স্থানীয় যুবকদের আড্ডা মদ্যপান চলে। উড়ে যাওয়া চিপসের প্যাকেটগুলি দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল গোদাপিয়াশাল স্কুলের শিক্ষক মণিকাঞ্চন রায়ের কথা। তিনিই এই হাটের প্রধান উদ্যোক্তা। গাছ তাঁর প্রাণ। রাস্তায় গাছ পড়ে থাকতে দেখলেও তুলে নিয়ে চলে আসেন। প্রথমে গাছটিকে সুস্থ করে তোলেন। তারপর কোনও একটি জায়গায় তা পুঁতে দেন। একবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে এক আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে যান। দেখেন একটি গাছকে কেউ ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। সেটিকে তুলে এনে ফের উপযুক্ত পরিবেশে লাগিয়ে দেন।
সেই মণিকাঞ্চন সরকারি বন্ধ্যা জমিতে সরকারি আধিকারিকের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছেন, 'সূর্যাস্তের হাট'। মেদিনীপুর শহর ঘেঁষা কাঁসাই নদীর ধারে রেল ব্রিজের কাছে ল্যাটেরাইট মাটিতে নিজ উদ্যোগে প্রায় দেড়শোর উপর চারা লাগিয়ে যত্ন করে বড় করে তুলেছেন। সূর্যাস্ত হাটে তিনি বসিয়েছেন স্থানীয় হাতের কাজে দক্ষ শিল্পী এবং দুঃস্থ অনেক মহিলাকে যাঁরা বাড়িতে বড়ি আচার তৈরি করে হাটে বিক্রি করেন। ক্রমে সেখানে হাতের কাজ ছাড়াও পত্রপত্রিকা আসে। করোনার সময় বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার চালু হয়েছে। তবু যেন সেই ছন্দে ফিরছে না।

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে নদীর কিনারায় আসি। বাঁদিকে রেল ব্রিজ। নদী অনেক নিচুতে। সেখানে গরু চরাতে এবং কাঠকুটো সংগ্রহ করতে দু-একজনকে দেখা গেল। ওদিকে যে নদীর ওপর এক শিল্পী তাঁর প্যালেটের সব লাল রঙ ঢেলে দিয়েছেন, আর সেই লালে মিশেছে ক্রমে গাঢ় হওয়া অন্ধকার, সেই অপূর্ব ছবি দেখার অবসর জীবন তাদের দেয়নি। আমরা এতক্ষণ চা খাব বলে কোলাহল করছিলাম, কিন্তু কাঁসাই নদীর ওপর অস্তরাগের রঙ আমাদের চুপ করিয়ে দিল। একদম নদীর ধারে একটা নিষ্পত্র শিমুল গাছ, আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনারত মানুষের মতো লাগছিল। সেদিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা হওয়ার একটা মানে নিজের বুকের ভেতরে টের পেলাম। সন্ধ্যা মানে সারা দিনের ব্যস্ততার অবসান, সারাদিন পর নিজের মুখোমুখি হবার সময়। মনে হল সুগোল লাল সূর্যের টুপ করে নদীবক্ষে ডুবে যাওয়া দেখতে না পেলেও কোন ক্ষতি হয়নি। যা দেখেছি, তা চিরকালের স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকল।

আচমকা ঝমঝম শব্দে পাশের রেল ব্রিজ দিয়ে উল্টোদিকে ট্রেন চলে গেল আর ট্রেনের জানলার খোপ খোপ আলো জলে এঁকে দিল সে কোন চিত্রকর! তবে চিত্রকর বড় আনমনা, তার আঁকা পরক্ষণেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল জল, সে তা খেয়ালই করল না। তবে জল মুছে দিলেও, আমাদের বুকে রয়ে গেল সেই ছবি । হাটে পসরা গোটাচ্ছিল সবাই। আমরা ভাঙা হাটের মধ্যে দিয়ে ভরা মন নিয়ে ফিরছিলাম। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল সত্যিকারের পর্যটন।

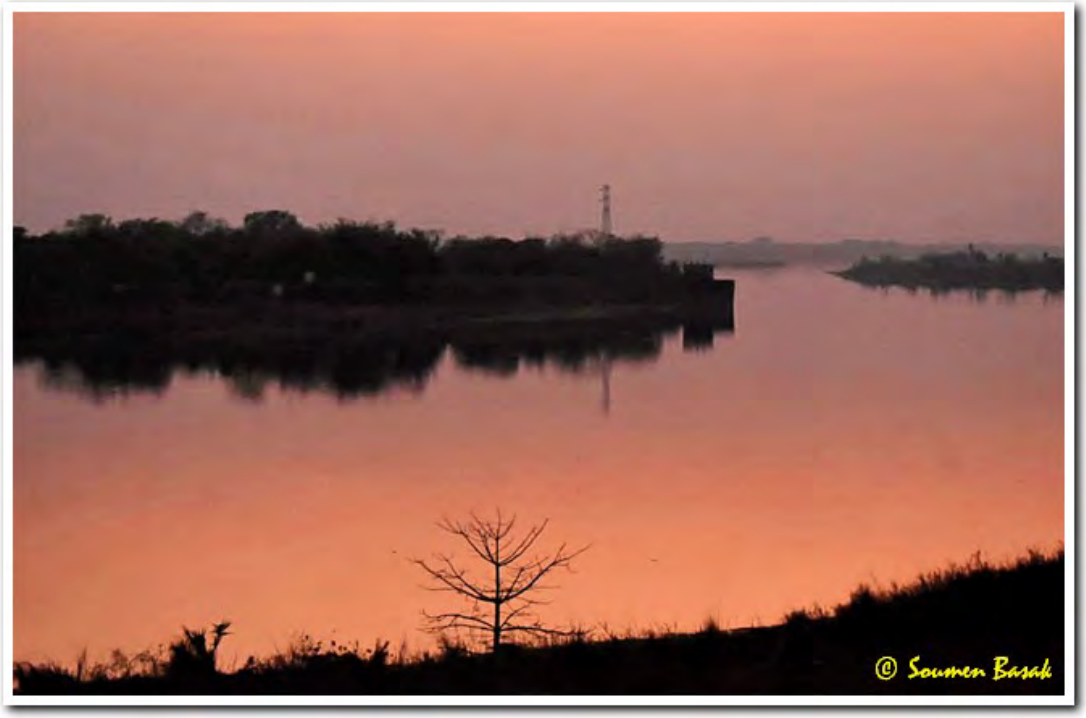

এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ কবি ও কথাকার তৃষ্ণা বসাক গল্প, উপন্যাস, কবিতা, কল্পবিজ্ঞান, মৈথিলী অনুবাদকর্মে পাঠকের সামনে খুলে দিচ্ছেন অনাস্বাদিত জগৎ। তাঁর বিভিন্ন গল্প-কবিতা ইংরেজি, হিন্দি, মালয়ালম, মৈথিলী ও ওড়িয়ায় অনূদিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রদত্ত ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার (২০১৩), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সোমেন চন্দ স্মারক সম্মান (২০১৮) সহ নানান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

রাবড়ি গ্রাম ভ্রমণ

সৌমাভ ঘোষ

দুর্গাপুজো ছাড়াও মিষ্টি হল বাঙালি জাতির আর একটা পরিচয়। এত ধরনের মিষ্টি, আর তাদের উদ্ভাবনের এতরকমের ইতিহাস, এ শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। এও তো একটা শিল্প। শিল্প থাকলেই থাকবে তার সমঝদার। তবে তো শিল্পীর মন ভরবে শিল্প সৃষ্টি করে। চিত্রকর চান দর্শক, গায়ক চান শ্রোতা, লেখক চান পাঠক। মিষ্টি শিল্পের কারিগর যারা 'মোদক' বা 'ময়রা' নামে পরিচিত, তাঁরাও চান সমঝদার যাদের এক কথায় বলা যায় 'খাদ্যরসিক' বা 'খাদক'। খাদক প্রজাতিটি না থাকলে ময়রার পরিশ্রম বৃথা। এবার আমাদের কথায় আসি। আমরা এই খাদক প্রজাতির। তবে এটা বললে পুরোটা বলা হয় না। আমরা পছন্দ করি যেখানে যে মিষ্টির উদ্ভব সেই স্থানে নিজেরা গিয়ে সেই মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করতে এবং সঙ্গে সেই জায়গাটি ঘুরে দেখতে। বাঙালির পায়ের তলায় যেমন আছে সর্ষে, তেমনই জিভে আছে মিষ্টির আস্বাদনের অনুভূতি। এছাড়াও এর ফলে ওই যে বলে 'রথ দেখা কলা বেচা' দুইই হয়। ঘুরতে ঘুরতে খাওয়া হয় বা খেতে খেতে ঘোরা হয়। এইভাবে কম জায়গায় তো আর মিষ্টির পিছু ধাওয়া করে গেলাম না! কলকাতার কথা বাদ দিলে, সরভাজা আর সরপুড়িয়ার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর, মিহিদানা, সীতাভোগের জন্য বর্ধমান, ক্ষীর দই-এর টানে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ, ছানাবড়ার আহ্বানে সুবে বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ, মনোহরার জন্য জনাই, জলভরা তালশাঁসের জন্য চন্দননগর। আর মজার ব্যাপার হল আমাদের দেশে রাজা বা নবাবের সংখ্যা অসংখ্য হওয়ায়, রাজকর্মচারীর সংখ্যাও অনেক। তাই মিষ্টি খেতে গিয়ে কোথাও হতাশ হতে হয় না। রাজা বা নবাবদের কীর্তি না থাকলেও রাজকর্মচারীদের নির্মাণ কাজ দেখে চোখ, মন আর মিষ্টি খেয়ে জিভ সার্থক করে ফেরা যায়। কিন্তু ২০২০ সালের দোলের আগের দিন আমরা পাড়ি জমিয়ে ছিলাম একটি অখ্যাত গ্রামে। গ্রামটির নাম আঁইয়া। যেখানে রাজা, বাদশাহ এমনকি রাজকর্মচারীদের কারোর কোনও কীর্তি নেই। কিন্তু এখানকার সৃষ্ট বস্তু সবারই মনোরঞ্জন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নেই যখন, সুতরাং মিষ্টিটাই একমাত্র লক্ষ্য। যখনকার কথা বলছি তখন করোনা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুই খবরের কাগজের পাতায়। তাই মাস্ক, স্যানিটাইজার, লকডাউন এগুলোর সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়িনি। সবই তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। সকাল সকাল বনহুগলী থেকে ২৬ সি বাসে চেপে বসলাম আমরা। অবশ্য বসার আগেই কচুড়ি, জিলিপি ও ধোঁয়া ওঠা চা দিয়ে রাতঘুমের ফাস্টিংটা ব্রেক করে নিয়েছিলাম। যেতে যেতে গন্তব্য সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া যাক। আগেই বলেছি গ্রামটি অখ্যাত হলেও তার পণ্য বিখ্যাত। তাই গ্রামের আসল নাম মুছে গিয়ে গ্রামটি এখন পণ্যের নামেই পরিচিত। তাই বাসে সেই নাম বলতেই বুঝে গেল। যথাসময়ে কন্ডাক্টর নামিয়ে দিল সেই গ্রামের রাস্তার মুখে। হেঁটে চললাম গ্রামের দিকে। আর প্রতিটা বাড়ি থেকেই নাকে আসতে লাগল দুধ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ।

ভনিতা অনেক হল। পাঠকরা নিশ্চয়ই ভাবছেন এ আবার কীরকম জায়গা। এবার এরা কি গরম দুধ খেতে এল নাকি! না না এসেছি আমরা রাবড়ি ভক্ষণ করতে। হ্যাঁ সেই রাবড়ি যাতে পাতলা দুধের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায় মোটা মোটা দুধের সর। "রাবড়ি" কে না ভালবাসে? রাবড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি অনেক করেছি। কিন্তু সেদিন আমরা সপরিবারে হানা দিয়েছিলাম সেই গ্রামে। যে গ্রাম এখন "রাবড়ি গ্রাম" নামে পরিচিত, আসল নামটি খাতায় কলমে হয়ত রয়েছে।

প্রতিটি ঘরে রাবড়ি তৈরি হচ্ছে আর ভেসে আসছে দুধ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ। কোথাও দুধ ঘন হচ্ছে, কোথাও বা গরম দুধে বাতাস করে সর তৈরি হচ্ছে, কেউ বা জমাট বাঁধা মোটা সর কাটছে। এই কাটা সরগুলোকেই ছেড়ে দেওয়া হয় জ্বাল দেওয়া দুধের মধ্যে। যেখানে তারা স্বচ্ছন্দে সাঁতরে চলে। রাবড়িকে যোগ্য সঙ্গত দিল মোটা রসের "সরভাজা"। এমনি সরভাজার থেকে তফাত হল দুপাশে মোটা সরের মাঝখানে রয়েছে ছানা, সুজি ও ময়দা মিশ্রিত পুর। সরভাজাটিকে দুই আঙুলে ধরে হাল্কা দাঁতের চাপ দিলেই সারা মুখ ঐ মিশ্রণে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সত্যিই এক স্বর্গীয় অনুভূতি। নতুন অভিজ্ঞতা, খাওয়াও হল। আবার কেনাও হল। এবার ফেরার পালা। প্রাক-হোরি খেলা একটা ক্ষুদ্র ভ্রমণ যা আমাদের মনন এবং রসনাকে রাঙিয়ে দিয়ে গেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.টেক. সৌমাভ ঘোষ বর্তমানে রেডিওফিজিক্স-এ পি.এইচ.ডি.রত। দেশবিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজের ফাঁকে অবসর কাটে বই পড়ে, ছবি এঁকে আর লেখালেখি করে। সবরকম বই পছন্দ হলেও ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও থ্রিলারের আকৃষ্ট করে খুব। এছাড়াও ভালবাসেন বেড়াতে - সমুদ্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বেশি পছন্দের। ভ্রমণের সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে ভোজন - "ফুড ওয়াক"।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu